দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

শরীয়তের আহকাম আর্কাইভ-২০১৮

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

মুসলিম খলিফার অপসারণের বিধান!..... ৫

মুসলিম গণহত্যা: জিহাদ ত্যাগের ভয়াবহ পরিণতি! ৯

জনসাধারণের উপর সকল মাসআলায় নির্দিষ্ট এক মাযহাবের তাকলীদ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে একটি সংশয়! ২৪

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০১ ..... ৩০

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০২ ..... ৩৩

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৩..... ৩৭

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৪ .....৪১

অঙ্গবিকৃতি (المثلة) কখন অবৈধ? ৪৫

সাহাবায়ে কিরাম রা:ই আমাদের আদর্শ.....৪৭

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৭: এক. বয়কট ও বর্জন ৫১

সংশয় নিরসনঃ শরয়ী দন্ডবীধি বাস্তবায়নের দায়িত্ব কি শুধু শাসকের?..... ৫৬

ইলম ও জিহাদ ৫৮

জিহাদ ও অন্যান্য ফরযের সমন্বয় সাধনই মধ্যম পন্থা ৭৩

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৮: দুই নির্বাসন..... ৮১

জিহাদ-কিতাল: কাকে বলে ও কত প্রকার; এক ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর ৮৫

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ০৯- তিন-চার. বন্দী ও প্রহার ৯২

দল করা সম্পর্কে সৌদি উলামা পরিষদের ফতুয়া ৯৬

ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ৯৯

ইসলামপন্থী গণতান্ত্রিকদের উদ্দেশ্য, কিছু সংশয় এবং তার নিরসন! ১০৬

আত্মঘাতী হামলা কি বৈধ? ১১৪

দারুল ইসলাম এবং দারুল হারব ১১৮
প্রসঙ্গঃ দারুল আমান ১৪৮
তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলসমূহ ১৬৯
ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ১৭৪
তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলসমূহ - ২য় পর্ব ১৭৬
ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ১০; পাঁচ. হত্যা ১৮০
ব্যক্তি দেখে 'হক' চেনা যায় না ১৮৪
অজ্ঞাত আমীরের হাতে বাইয়াত: ইমামের পরিচয় কতটুকু জরুরী? ১৮৬
যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৯ ..... ১৯৫
জিহাদ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর যা এক ভাই জানতে চেয়েছেন ২০২
আল্লাহর আইনের বিপরীত বিচার করা : ইসলাম কী বলে? ২১২
দারুল হরবে জুমআ ২১৭

মুসলিম খলিফার অপসারণের বিধান!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০১-০৪-২০১৮

এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, যার খোলাসা:

(মুসলিম খলিফা বা আমীর যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত নেন, যা উম্মাহর জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে, ফিতনার রাস্তা খুলে দেবে- তাহলে আহলে হল ওয়াল আকদ ও ক্ষমতাশীল নেতৃবৃন্দ তাকে অপসারণ করতে পারবেন কি'না?)

ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদানকল্পেই আমার এ লেখা।

প্রথমে এখানে কয়েকটি মূলনীতি বুঝে নেয়া চাই-

- আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীতে কারোও আনুগত্য বৈধ নয়। কাজেই ইমাম যদি এমন কোন কাজের আদেশ দেন, যা শরীয়ত বিরোধি- তাহলে তা মান্য করা জায়েয হবে না, বরং শরীয়তের আদেশের উপরই অটল অবিচল থাকতে হবে।

- ইমাম নিয়োগ দেয়া হয় উম্মাহর দ্বীনি ও দুনিয়াবি মাসলাহাত দেখাশুনার জন্য। কাজেই ইমামের দ্বারা যদি মুসলিম উম্মাহর দ্বীন ও দুনিয়ার মাসলাহাত অর্জন ও সংরক্ষিত হওয়ার পরিবর্তে বরং তা নষ্ট হয়, তাহলে সেই ইমাম আর ইমামের আসনে থাকার যোগ্য থাকে না।

উম্মাহর মাসলাহাত নষ্ট হতে পারে কয়েক কারণে-

ইমামের ফিসক ও জুলুমের কারণে।

ইমামের অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতার কারণে (যদিও ইমাম পরহেযগার ও মুত্তাকী ব্যক্তি হয়।)

ইমামের অক্ষমতা ও ক্ষমতাহীনতার কারণে (যদিও ইমাম পরহেযগার ও মুত্তাকী ব্যক্তি হয়।)

এ সকল ক্ষেত্রেই ইমাম আর ইমামতের আসনে থাকার যোগ্য থাকে না, বরং বরখাস্ত করার করার উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

- বরখাস্তের উপযুক্ত হয়ে পড়া আর তার বিরোদ্ধে স্বশস্ত্র বিদ্রোহ করে তাকে বরখাস্ত করে ফেলা এক জিনিস নয়। বরখাস্তের উপযুক্ত হয়ে পড়ার অর্থ- তিনি এখনও মুসলমানদের ইমাম হিসেবেই বহাল আছেন, তবে মুসলমানদের উচিৎ হল তাকে বরখাস্ত করে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেয়া।

- ইমাম যত দিন ইমাম হিসেবে বহাল আছেন (যদিও ফাসেক ও জালেম হয়; কাফের, মুরতাদ বা তাগুত না হয়) তত দিন তার জন্য দোয়া করতে হবে। শরীয়তসম্মত সকল কাজে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। (তবে শরীয়ত বিরোধি কোন কাজে তাকে সহযোগিতা করা যাবে না, তার শরীয়ত বিরোধি কোন আদেশ পালন করা যাবে না।) তাকে সুপরামর্শ দিতে হবে। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

- প্রজাসাধারণের উপর জুলুম করলেও খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বরং জুলুম অত্যাচার সহ্য করে যাওয়ার প্রতি হাদিসে তা'কিদ ও উৎসাহ এসেছে। তবে তা তত দিন, যত দিন তিনি শরীয়ত কায়েম রাখেন; শরীয়তের বুনিয়াদি ও মৌলিক বিধানে কোন পরিবর্তন না আনেন।

- ক্ষমতাধর কোন জালেম ও ফাসেক মুসলিম ইমামকে বরখাস্ত করতে গেলে রক্তপাত অবধারিত। ইসলাম যথাসম্ভব মুসলমানদের পারস্পরিক রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেয়।

- যেখানে লাভ-ক্ষতি উভয়টারই সম্ভবনা আছে, ইসলাম সেখানে লাভ যেটাতে তুলনামূলক বেশি সেটা করার আদেশ দেয়, অপরটা বর্জন করার আদেশ দেয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বুঝার পর এবার আসুন প্রশ্নের জওয়াবে-

ইমাম যদি এমন কোন কাজের আদেশ দেন যা শরীয়তে নিষিদ্ধ, কিংবা এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য নিশ্চিত ক্ষতিকর- তাহলে মুসলমানদের প্রথম কাজ হল- দলীল প্রমাণ দিয়ে ইমামকে বুঝানো যে, উক্ত কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ কিংবা উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর। বুঝানোও পর যদি ইমাম তার আদেশ ও সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেন, তাহলে তো আলহামদু লিল্লাহ। কিন্তু দলীল প্রমাণ

দিয়ে স্পষ্টরূপে বুঝানোও পরও যদি তিনি তার সিদ্ধানে অটল থাকেন কিংবা জোরপূর্বক উম্মাহকে উক্ত নাজায়েয ও ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করেন, তাহলে উক্ত ইমাম বরখাস্তের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে (তবে এখনও বরখাস্ত হননি।) এমতাবস্থায় মুসলমানদের করণীয় হল-

প্রথমত: উক্ত নাজায়েয ও ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। ইমামকে এ কাজে কোন ধরণের সহায়তা না করা।

দ্বিতীয়ত: যদি রক্তপাত ছাড়াই তাকে বরখাস্ত করে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেয়া যায়, তাহলে বরখাস্ত করে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেয়া।

তৃতীয়ত: যদি রক্তপাত ছাড়া বরখাস্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে দেখতে হবে- তাকে বরখাস্ত করাতে মাসলাহাত বেশি, না'কি তাকে বহাল রেখে তার জুলুম অত্যাচার সহ্য করে যাওয়াতে মাসলাহাত বেশি। যদি বরখাস্তের মধ্যে মাসলাহাত বেশি হয়, তাহলে তাকে বরখাস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বরখাস্ত করতে গেলে আরোও বেশি ফেতনা ফাসাদের সম্মুখিন হওয়ার আশঙ্খা থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা, বরং জুলুম অত্যাচার সহ্য করে যাওয়া। যথাসম্ভব আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে সমাজ ও খলিফাকে সংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

বি.দ্র-১:

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস স্বাক্ষী- এ পর্যন্ত যত জালেম মুসলিম শাসককে অপসারণ করতে বিদ্রোহ করা হয়েছে, সবগুলোতেই লাভের বদলে ক্ষতি হয়েছে। তাই আহলে হল ওয়াল আকদকে বিষয়টি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে বিবেচনা করে দেখতে হবে। যদি বিদ্রোহের মধ্যে লাভটা নিশ্চিত না হয়, তাহলে বিদ্রোহ না করা চাই। তবে ইতিহাসের আলোকে বলা যায়- সাধারণত এসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহের দ্বারা ফায়েদা হবে না। তাই বিদ্রোহ না করে অন্য উপায়ে (যেমন- মজলিসে শূরার মাধ্যমে) বরখাস্ত করার চেষ্টা করা উচিৎ। যদি বরখাস্ত সম্ভব না হয়, তাহলে ইসলাহের চেষ্টা করে যাওয়া উচিৎ। এতেই ইনশাআল্লাহ মাসলাহাত।

বি.দ্র-২:

উপরোক্ত বিধান মুসলিম খলিফার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে খলিফা যদি মুরতাদ হয়ে যায় (যেমন- বর্তমান শাসকগোষ্ঠী) তাহলে উক্ত বিধান নয়। বরং মুরতাদ হওয়ার

সাথে সাথে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তাকে আর ক্ষমতায় বহাল রাখা যাবে না। যতই রক্তপাত হোক, তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কখন, কিভাবে করা হবে- সেটা উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভেবে দেখবেন। তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী তখন কাজ করে যেতে হবে। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম!

[যদি আমার লেখায় কোন ভুল হয়ে থাকে, তাহলে কোন ভাই শুধরিয়ে দিলে আমি বড়ই কৃতজ্ঞ থাকবো।]

পোস্ট লিংক : https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৬২৪

মুসলিম গণহত্যা: জিহাদ ত্যাগের ভয়াবহ পরিণতি!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-২৬-২০১৭

কয়েক দিন পূর্বে এক ভাই (গণহত্যা) শিরোনামে একটা পোস্ট দিয়েছেন। তাতে তিনি কয়েকটা আয়াত ও হাদিস এনে দেখাতে চেষ্টা করেছেন- আরাকান, কাশ্মির সহ অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে চলমান গণহত্যার মূল কারণ- জিহাদ ছেড়ে দেয়া। আমরাও যদি জিহাদ ছেড়ে বসে থাকি, তাহলে আমাদের উপরও এই গণহত্যা আপতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আরেক ভাই এ লেখাটাকে একটু তাহকীক ও পরিমার্জন করে দেয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। এর ভিত্তিতেই আমার এ লেখা। মূল কথা ভাইয়ের লেখায় এসে গেছে। আমি আরেকটু তাহকীকের সাথে বিষয়টা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে কবুল করুন।

কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট বিধৃত হয়েছে যে, জিহাদ ছেড়ে দিলে মুসলমানদের উপর আযাব-গজব, শাস্তি-অপমান আর লাঞ্ছনা নেমে আসবে। আখেরাতের আযাব তো আছেই, দুনিয়াতেই তাদের উপর এগুলো আপতিত হবে। তাদের শত্রুরা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। আর কাফেররা যদি কখনো মুসলমানদের বাগে পায়, তাহলে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাবে। তাদেরকে অপদস্ত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)

“কিভাবে (তোমরা তাদের বিশ্বাস করবে)? এরা যদি কখনো তোমাদের উপর জয় লাভ করতে পারে, তাহলে তারা (যেমনি) আত্মীয়তার বন্ধনের তোয়াক্কা করবে

না, (তেমনি) চুক্তির মর্যাদাও তারা দেবে না। তারা (শুধু) মুখ দিয়ে তোমাদের খুশি রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অন্তরগুলো সেসব কথা (কিছুতেই) মেনে নেয় না। মূলত এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অবাধ্য। এরা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে এবং মানুষকে তাঁর পথ থেকে দূরে রেখেছে। তারা যা করছে, নিশ্চয়ই তা বড় জঘন্য কাজ। (কোনো) ঈমানদার লোকের ব্যাপারে এরা (যেমন) আত্মীয়তার ধার ধারে না, (তেমনি) কোন অঙ্গীকারের মর্যাদাও এরা রক্ষা করে না। মূলত এরাই সীমালঙ্ঘনকারী।" (তাওবা: ৮-১০)

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

{إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ}

"(তাদের চরিত্র হচ্ছে এই যে) যদি এরা তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের মারাত্মক শত্রুতে পরিণত হবে। (শুধু তাই নয়) নিজেদের হাত ও কথা দিয়ে তোমাদের তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে। (আসলে) এরা এটাই চায় যে, তোমরাও তাদের মতো কাফের হয়ে যাও।" (মুমতাহিনা: ২)

এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এ হীন চরিত্রের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

এই সীমালঙ্ঘনকারী, অবাধ্য, পাপাচারি ও হীন চরিত্রের কাফেরদের দমানোর জন্য আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّه لِلّهِ}

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন-আনুগত্য পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" (আনফাল: ৩৯)

{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ}

"অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়: তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (তাওবা: ৫)

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

"তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।" (তাওবা: ২৯)

এখন যদি মুসলমানরা আল্লাহর আদেশের মূল্য না দিয়ে জিহাদ ছেড়ে দুনিয়ার সুখ-শান্তি আর আরাম-আয়েশে লিপ্ত হয়, তাহলেই দেখা দেবে বিপত্তি। তাদের দুশমনরা তাদের উপর চেপে বসবে। তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাবে। তাদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবে। তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবে। এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদিসে সতর্কবাণী এসেছে। এখানে আমি কয়েকটা আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করছি:

আয়াত

আয়াত-১:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তাহলে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওম আনয়ন করবেন। তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” (তাওবা: ৩৮-৩৯) এ আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যদি তোমরা প্রয়োজনের সময় জিহাদে বের না হও, তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। এ শাস্তি আখেরাতে যেমন আসবে, দুনিয়াতেও আসবে।

আল্লামা সা’দী রহ. (মৃত্যু: ১৩৭৬হি.) বলেন,

إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} في الدنيا والآخرة. اهـ

“যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তাহলে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন।” (তাফসীরে সা’দী: ৩৩৭)

আল্লামা নাসাফী রহ. (মৃত্যু: ৭১০হি.) বলেন,

أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول عذاب الدراين و أنه يهلكهم ويستبدل بهم قوما آخرين خيرمنهم وأطوع. اهـ

“আল্লাহ তাআলা (দুনিয়া বা আখেরাত- এর কোন একটার মাঝে সীমাবদ্ধ করণ ব্যতীত) নিঃশর্ত আযাবের ধমকি দিয়েছেন, যার মাঝে দুনিয়া-আখেরাত উভয় আযাবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি (এও জানিয়েছেন যে, তিনি) তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। তাদের স্থলে অন্য জাতি আনয়ন করবেন, যারা তাদের চেয়ে উত্তম

এবং তাদের চেয়ে আল্লাহ তাআলার অধিক আনুগত্যশীল হবে।" (তাফসীরে নাসাফী: ১/৬৮০)

ইবনে আশূর রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) মত ব্যক্ত করেছেন, এ আয়াতে বিশেষভাবে দুনিয়াবি শাস্তির কথাই বলা হয়েছে। কারণ, এ আয়াতে জিহাদ ছেড়ে দেয়ার দুটি পরিণতির কথা বলেছেন-

১. আল্লাহর আযাব আপতিত হবে।

২. তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন।

এ দুটি পরিণতির কথা একই আয়াতে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্য জাতি সৃষ্টি যেহেতু দুনিয়াতেই হবে, তাই তার সাথে উল্লেখিত আযাবও দুনিয়াতেই আসবে। আর এ আযাব হবে- কাফেরদের বিজয় এবং মুসলমানদের গণহত্যা।

ইবনে আশূর রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন,

وقيل: المراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا كقوله: أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا [التوبة: 52] ... وقد يرجح هذا الوجه بأنه قرن بعو اقب دنيوية في قوله: ويستبدل قوما غيركم ... فالمقصود تهديدهم بأنهم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم العدو في ديارهم فاستأصلوهم و أتى الله بقوم غيرهم. اهـ

"বলা হয়, আয়াতে 'যন্ত্রণাদায়ক আযাব' দ্বারা উদ্দেশ্য- দুনিয়াতেই শাস্তি আপতিত হবে, যেমন- আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে দুনিয়াবি শাস্তি উদ্দেশ্য:

{أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا}

'তোমাদের ব্যাপারে আমরা প্রতিক্ষায় আছি: আল্লাহ তাআলা হয়তো নিজ হাতে তোমাদের শাস্তি দেবেন, নতুবা আমাদের হাত দিয়ে (তোমাদের উপর শাস্তি পৌঁছাবেন)। (তাওবা: ৫২)

এ ব্যাখ্যাটি এ দিক থেকে অগ্রাধিকার পায় যে, আল্লাহ তাআলার বাণী- 'তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওম আনয়ন করবেন' এর মাধ্যমে দুনিয়াবি যে শাস্তির কথা বিধৃত করেছেন, এরই সাথে একে উল্লেখ করেছেন। ... উদ্দেশ্য- যদি

তারা জিহাদে বের না হয়ে বসে থাকে, তাহলে তাদের শত্রুরা তাদের দেশে আক্রমণ করে তাদেরকে সমূলে হত্যা করবে। তখন আল্লাহ তাআলা (দ্বীনের নুসরত ও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) অন্য এক জাতি আনয়ন করেবেন।" (আত-তাহরিরু ওয়াত-তানভীর: ১০/১৯৯)

আয়াত-২:

{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}

"বলুন (হে নবী!) তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ- যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাআলার (পক্ষ থেকে তাঁর আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (তাওবা: ২৪)

এসব জিনিস জিহাদের চেয়ে প্রিয় হওয়ার অর্থ- এগুলোর কারণে জিহাদ ছেড়ে দেয়া। আর যখন জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখনই আল্লাহ তাআলার আযাব আপতিত হবে। আযাব বিভিন্নভাবে আসতে পারে: আসমানী মুসিবতও হতে পারে, আবার কাফেরদের হাতে নিষ্পেষিত হওয়ার মাধ্যমেও হতে পারে, যেমনটা ১ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

আল্লামা আলূসি রহ. (মৃত্যু: ১২৭০হি.) বলেন,

فَتَرَبَّصُوا أي انتظروا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ أي بعقوبته سبحانه لكم عاجلا أو آجلا على ما روي عن الحسن. اهـ آ:2\409

"হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত (আয়াতের অর্থ): তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাআলার শাস্তির, দুনিয়াতে কিংবা আখিরাতে।" (রুহুল মাআনী: ২/৪০৯)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন,

أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله ... أي: إن كانت هذه الأشياء (أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا) أي: فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛

...

وروى الإمام أحمد، وأبو داود –واللفظ له –من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". اهـ

"যারা নিজেদের পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদের উপর অগ্রাধিকার দেবে, তাদেরকে শাস্তির হুঁশিয়ারি শুনাতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ দিয়েছেন। ... অর্থাৎ যদি এ সকল বিষয় তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর ঐ মর্মন্তুদ আযাব ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির, যা তোমাদের উপর আপতিত হবে।

...

ইমাম আহমদ রহ. এবং আবু দাউদ রহ. হযরত ইবনে উমার রাদি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- 'যখন তোমরা সুদি কারবারে লিপ্ত হবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, কৃষি কাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে- তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন লাঞ্ছনা। যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ তোমাদের থেকে তা দূর করবেন না।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১২৪)

আয়াত-৩:

{وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

"তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান (সুকর্ম) কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন(সুকর্মশীল)দেরকে ভালোবাসেন।" (বাক্বারা: ১৯৫)

অর্থাৎ তোমরা যদি অর্থ-সম্পদ অর্জনের দিকে মনোনিবেশ কর, সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখ, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে তা ব্যয় না কর, তাহলে কাফেররা তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। কাজেই জিহাদ ছেড়ে অর্থ-সম্পদের দিকে মনোনিবেশ করে নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযি রহ. বর্ণনা করেন-

عن أبي عمران التجيبي قال: "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية , وعلى أهل مصر عقبة بن عامر - ﷺ - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأخرج الروم إلينا صفا عظيما منهم وألصقوا ظهورهم بحائط المدينة فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر, فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم , فصاح الناس وقالوا: مه , مه؟ , لا إله إلا الله , يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري - ﷺ - فقال: يا أيها الناس , إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل , و إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار , لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه , قال بعضنا لبعض - سرا دون رسول الله - ﷺ -: إن أموالنا قد ضاعت , وإن الله قد أعز الإسلام , وكثر ناصروه , فلو أقمنا في أموالنا , فأصلحنا ما ضاع منها , فأنزل الله على نبيه - ﷺ - يرد علينا ما قلنا: {و أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها , وندع

الجهاد .قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية" [جامع الترمذي: 2972]

“আবু ইমরান আত-তুজিবি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুসতুনতুনিয়ার জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। তখন মিশরের গভর্নর ছিলেন হযরত উকবা ইবনে আমের রাদি.। আমাদের জামাতের আমির ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রহ.। রোমবাসী আমাদের বিরুদ্ধে তাদের বিশাল এক বাহিনী পাঠাল। তারা তাদের শহরের দেয়ালের দিকে পশ্চাত করে তাদের সারি সাজালো। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের থেকে তেমনই কিংবা তার চেয়েও বড় এক বাহিনী বের হল। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি রোমানদের বিশাল সারিতে একাই হামলা করে বসল এবং তাদের সারির একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে গেল (যার ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল)। তখন লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো- ‘(কি কর?) থাম! থাম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ ব্যক্তি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে।’ তখন আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ‘ওহে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা করছো। (তোমাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয়।) এ আয়াত তো আমরা আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করলেন, তার সাহায্যকারীও অনেক হয়ে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগোচরে আমাদের একে অপরকে বললো- আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীও তৈয়ার হয়েছে অনেক। কাজেই আমরা যদি (কিছু দিন জিহাদ বন্ধ রেখে) আমাদের ধন-সম্পদের কাছে অবস্থান করে সেগুলোর পরিচর্যা করতাম! তখন আমাদের এই মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ আয়াত নাযিল করলেন-

{و أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}

“তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না।”

অতএব, ধ্বংসে নিক্ষেপ করার অর্থ- জিহাদ ছেড়ে আমাদের ধন-সম্পদের পরিচর্যায় লিপ্ত হওয়া।'

আবু ইমরান রহ. বলেন, এরপর থেকে আবু আইয়ূব আনসারি রাদি. সর্বদা জিহাদেই লিপ্ত থাকেন। অবশেষে যখন শহীদ হলেন, তখন কুসতুনতুনিয়াতে তাকে দাফন করা হয়।" (জামে তিরমিযি: হাদিস নং ২৯৭২)

হাদিস

হাদিস-১:

عن أبي بكر الصديق - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ما ترك قوم الجهاد , إلا عمهم الله بالعذاب" [المعجم الأوسط للطبراني: 3839؛ الترغيب والترهيب: 2158، قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن]

"হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে জাতিই জিহাদ ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন।" (মু'জামে ত্বরানী: ৩৮৩৯)

এই ব্যাপক আযাব গণহত্যার সূরতেও হতে পারে।

হাদিস-২:

عن عبد الله بن عمر ﷺ عن النبي صلى الله عيه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" [ابو داوود: 3464]

"হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে বর্ণিত যে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'যখন তোমরা সুদি কারবারে লিপ্ত হবে, গরুর লেজ

ধরে পড়ে থাকবে, কৃষি কাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে- তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন লাঞ্ছনা। যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ তোমাদের থেকে তা দূর করবেন না।" (সুনানে আবু দাউদ: ৩৪৬৪)

কৃষি কাজে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ- কৃষি কাজসহ অন্যান্য দুনিয়াবি কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে জিহাদ ছেড়ে দেয়া। তখনই তা লাঞ্ছনার কারণ হবে। যেমন, বুখারী শরীফের হাদিসে এসেছে-

হাদিস-৩:

عن أبي أمامة الباهلي – ﷺ – قال – ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث – فقال: سمعت النبي – ﷺ – يقول: " لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل "
[صحيح البخاري: 2321]

"হযরত আবু উমামা বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একদা একটা লাঙ্গলের ফলা এবং আরো কয়েকটা কৃষি-যন্ত্র দেখে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এগুলো যে ঘরেই প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা সেখানেই লাঞ্ছনা ঢুকিয়ে দেবেন।" (সহীহ বুখারী: ২৩২১)

২ নং হাদিসে দ্বীনে ফিরে আসার দ্বারা উদ্দেশ্য- সুদি কারবার বর্জন করা এবং জিহাদের পথে বাধা এমন সব দুনিয়াবি পেশা-কর্ম বাদ দিয়ে আবার জিহাদে ফিরে আসা। যেমন, মুসনাদে আহমদের এক হাদিসে এসেছে-

হাদিস-৪:

عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه" [المسند للإمام أحمد: 5007]

“যদি তোমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়ে গরুর লেজ ধরে পড়ে থাক এবং সুদি কারবারে লিপ্ত হও, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঘাড়ে এমন এক লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা তোমাদের থেকে দূর হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আস।” (মুসনাদে আহমদ: ৫০০৭)

হাদিস-৫:

عن أبي أمامة الباهلي – ﷺ – قال: قال رسول الله – ﷺ -: " من لم يغز, أو يجهز غازيا , أو يخلف غازيا في أهله بخير , أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة " [ابو داود: 2505، ابن ماجه: 2762

“হযরত আবু উমামা বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজেও যুদ্ধ করেনি, কোন যুদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করেও দেয়নি এবং উত্তমভাবে কোন মুজাহিদের পরিবারের দেখাশুনাও করেনি, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের পূর্বেই তাকে কোন ধ্বংসাত্মক বিপদে নিপতিত করবেন। (আবু দাউদ: ২৫০৫)

হাদিস-৬:

عن أبي عمران التجيبي قال: "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية , وعلى أهل مصر عقبة بن عامر - ﷺ - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأخرج الروم إلينا صفا عظيما منهم وألصقوا ظهورهم بحائط المدينة فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر, فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم , فصاح الناس وقالوا: مه , مه؟ , لا إله إلا الله , يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري - ﷺ - فقال: يا أيها الناس , إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل , و إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار , لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه , قال بعضنا لبعض - سرا دون رسول الله - ﷺ -: إن أموالنا قد ضاعت , وإن الله قد أعز الإسلام , وكثر ناصروه , فلو أقمنا في أموالنا , فأصلحنا ما ضاع

منها , فأنزل الله على نبيه - ﷺ - يرد علينا ما قلنا: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها , وندع الجهاد .قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية" [جامع الترمذي: 2972]

“আবু ইমরান আত-তুজিবি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুসতুনতুনিয়ার জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। তখন মিশরের গভর্নর ছিলেন হযরত উকবা ইবনে আমের রাদি.। আমাদের জামাতের আমির ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রহ.। রোমবাসী আমাদের বিরুদ্ধে তাদের বিশাল এক বাহিনী পাঠাল। তারা তাদের শহরের দেয়ালের দিকে পশ্চাত করে তাদের সারি সাজালো। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের থেকে তেমনই কিংবা তার চেয়েও বড় এক বাহিনী বের হল। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি রোমানদের বিশাল সারিতে একাই হামলা করে বসল এবং তাদের সারির একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে গেল (যার ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল)। তখন লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো- ‘(কি কর?) থাম! থাম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ ব্যক্তি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে।’ তখন আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ‘ওহে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা করছো। (তোমাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয়।) এ আয়াত তো আমরা আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করলেন, তার সাহায্যকারীও অনেক হয়ে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগোচরে আমাদের একে অপরকে বললো- আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীও তৈয়ার হয়েছে অনেক। কাজেই আমরা যদি (কিছু দিন জিহাদ বন্ধ রেখে) আমাদের ধন-সম্পদের কাছে অবস্থান করে সেগুলোর পরিচর্যা করতাম! তখন আমাদের এই মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ আয়াত নাযিল করলেন-

و أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

“তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না।” অতএব, ধ্বংসে নিক্ষেপ করার অর্থ- জিহাদ ছেড়ে আমাদের ধন-সম্পদের পরিচর্যায় লিপ্ত হওয়া।’

আবু ইমরান রহ. বলেন, এরপর থেকে আবু আইয়ূব আনসারি রাদি. সর্বদা জিহাদেই লিপ্ত থাকেন। অবশেষে যখন শহীদ হলেন, তখন কুসতুনতুনিয়াতে তাকে দাফন করা হয়।” (জামে তিরমিযি: হাদিস নং ২৯৭২)

হাদিস-৭:

عن ثوبان قال: قال رسول الله -ﷺ- : "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت" [ابو داود: 4299]

“হযরত সাওবান রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন অন্য জাতি-গোষ্ঠীগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে আহ্বান করবে, যেমন খাবার পাত্র সামনে নিয়ে একে অপরকে ডাকাডাকি করতে থাকে। এক জন জিজ্ঞেস করল, তখন আমাদের সংখ্যার স্বল্পতার কারণে কি এমনটা হবে? তিনি উত্তর দিলেন, (না) বরং তোমরা তখন সংখ্যায় থাকবে অনেক। কিন্তু তোমরা তখন স্রোতে ভাসমান খর-কুটার মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন। আর তোমাদের অন্তরে আল্লাহ ঢেলে দেবেন ‘ওয়াহান’। এক জন জিজ্ঞেস করল, ‘ওয়াহান’ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি উত্তর দিলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং মরণের ভয়।” (আবু দাউদ: ৪২৯৯) অন্য বর্ণনায় এসেছে-

"يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق" [المسند للامام أحمد: 22397]

“অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে অন্য জাতি-গোষ্ঠীগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে আহ্বান করবে।” (মুসনাদে আহমদ: ২২৩৯৭)

মরণের ভয় দ্বারা যুদ্ধ-জিহাদে অনিহা এবং শহীদি মরণের ভীতি উদ্দেশ্য। যেমন, মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় এসেছে-

" قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال" [المسند للامام أحمد: 8713]

“সাহাবগণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওয়াহান’ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি উত্তর দিলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং যুদ্ধের প্রতি অনিহা।” (মুসনাদে আহমদ: ৮৭১৩)

اللهم احفظنا من كلّ بلاء في الدنيا وعذاب في الآخرة، وجنِّبنا مكائد الشيطان والظلم والخيانة والكيد والحسد وغيرها من الآفات برحمتك يا أرحم الراحمين.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৫৪৭

জনসাধারণের উপর সকল মাসআলায় নির্দিষ্ট এক মাযহাবের তাকলীদ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে একটি সংশয়!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-২২-২০১৭

মুফতী শফী রহ. এর **'জাওয়াহিরুল ফিকহ'** এবং মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. এর **'তাকলীদ কি শরয়ী হাইসিয়্যাত'** কিতাবদ্বয় থেকে বুঝা যাচ্ছে, জনসাধারণের জন্য সকল মাসআলায় কোন এক মাযহাব মেনে চলা আবশ্যক। যা থেকে বুঝা যাচ্ছে, হানাফী মাযহাবের অনুসারী কোন সাধারণ মুসলামনকে সর্বদা হানাফী মুফতীর কাছেই মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হবে এবং সে অনুযায়ীই আমল করতে হবে। অন্য কোন মাযহাবের মুফতীর ফতোয়া অনুযায়ী আমল করতে পারবে না।

কিন্তু ফতোয়া শামী দেখার পর বিষয়টা খটকা লাগছে। ফতোয়া শামীতে ইবনুল হুমাম রহ. (মৃত্যু ৮৬১ হি.) এর যে বক্তব্য আল্লামা শামী রহ. (মৃত্যু ১২৫২ হি.) উল্লেখ করেছেন এবং তিনি নিজেও তা সমর্থন করেছেন তা থেকে এর বিপরীত বুঝা যাচ্ছে। সেখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, সাধারণ জনগণের জন্য সকল মাসআলায় কোন এক মাযহাব মেনে চলা আবশ্যক নয়। তবে যে মাসআলায় একবার কোন মাযহাব মতে আমল করেছে, অনন্যোপায় না হলে সে মাসআলাতে উক্ত মাযহাব থেকে ফিরে গিয়ে অন্য মাযহাব মতে আমল করতে পারবে না। তবে যদি এমন মাসআলা সামনে আসে যে মাসলাতে এখনো সে কোন মাযহাব মতে আমল করেনি তাহলে উক্ত মাসআলাতে অন্য মাযহাব মতেও আমল করতে পারবে। তবে এরপর থেকে অনন্যোপায় না হলে উক্ত মাসআলাতে উক্ত মাযহাব থেকে ফিরে গিয়ে অন্য মাযহাব মতে আমল করতে পারবে না। কারণ, ইতিপূর্বে যে মাযহাব

মতে সে আমল করেছে তা তার বিশ্বাস অনুযায়ী সঠিক ছিল। এখন কোন ওজর ছাড়াই অন্য মাযহাবে চলে যাওয়াটা হবে দ্বীন নিয়ে তামাশার শামিল, যা নিষিদ্ধ। যদি বিশেষ কোন জরুরত ছাড়াই শুধু খাহেশাতের কারণে কিংবা দুনিয়াবী কোন লাভের কারণে অন্য মাযহাবে চলে যায় তাহলে এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। তাকে তা'জীর করা হবে এবং তার আদালাত-ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হয়ে গেছে বলা ধরা হবে। ফলে তার শাহাদাত-স্বাক্ষ্য কবুল হবে না।

এ থেকে বুঝে আসছে, বর্তমানে যারা হারামাইন শরীফাইন বা অন্য এমন কোন অঞ্চলে বসবাস করেন যেখানে বিভিন্ন মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মুফতী বিদ্যমান, তাদের সামনে যদি এমন কোন নতুন মাসআলা আসে যে মাসআলাতে ইতিপূর্বে তারা কোন মাযহাব মতে আমল করেননি, তারা চাইলে উক্ত মাসআলায় নিজের মাযহাবের মুফতীর কাছে না গিয়ে অন্য মাযহাবের মুফতীর কাছে জিজ্ঞাসা করেও আমল করতে পারবেন।

বি.দ্র: তবে এক্ষেত্রে যে মুফতীকে জিজ্ঞাসা করবেন তাকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। যে কোন আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। তদ্রূপ নিজে কোন বইয়ে পড়ে বা শুনে শুনে আমল করে ফেলা যাবে না।

এবারে আমি আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যটি তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام: مسألة لا يرجع فيما قلد فيه أي عمل به اتفاقا، وهل يقلد غيره في غيره؟ المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي، فقيل يلزم، وقيل لا، وقيل مثل من لم يلتزم، وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا اهـ ملخصا

"মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. এর কিতাব 'আত-তাহরীর' এর শেষের দিকে বলা হয়েছে, 'মাসআলা: ((যে মাসআলায় একবার কোন ইমামের তাকলীদ করে আমল করেছে সে মাসআলা থেকে আর ফিরে আসতে পারবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। অন্য মাসআলাতে কি অন্য ইমামের তাকলীদ করতে পারবে? গ্রহণযোগ্য মত হল পারবে। কারণ, অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, সালাফগণ একসময়

একজনের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন অন্যসময় অন্যজনের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। আবশ্যিকভাবে কোন এক মুফতীকেই মেনে চলতেন না।

যদি কোন এক মাযহাবকে নিজের জন্য মেনে চলা আবশ্যক করে নেয়; যেমন, হানাফী মাযহাব বা শাফিয়ী মাজহাব, তাহলে বলা হয়,

- (উক্ত মাযহাব মেনে চলাই) আবশ্যক হবে।

- আবার এও বলা হয় যে, আবশ্যক হবে না।

- এও বলা হয় যে, এই ব্যক্তির বিধান ঐ ব্যক্তির মতই যে কোন এক মাযহাব মতে চলা নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়নি।

এই শেষোক্ত মতটিই সঠিক বলে প্রবল ধারণা হচ্ছে। কারণ, শরীয়তে এমন কোন দলীল নেই যা এক মাযহাব মতে চলাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করে।)) সংক্ষিপ্তাকারে ইবনুল হুমাম রহ. এর বক্তব্য শেষ হল।" **[ফাতাওয়া শামী: বাবুত তা'জীর।]**

এ থেকে এও বুঝে আসছে যে, আমরা যারা নিজেদেরকে হানাফী, হাম্বলী ইত্যাদী বলে দাবি করি তাদের জন্য সকল মাসআলাতে হানাফী বা হাম্বলী বা অন্য কোন মাযহাব মতে আমল করা জরুরী নয়। বরং যে মাসআলা নতুন, যাতে এখনোও কোন মাযহাব মতে আমল করিনি, সে মাসআলাতে অন্য মাযহাব মতে আমল করা যাবে।

আল্লামা শামী রহ. অন্যত্র বলেন,

العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه ثم قال وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب ولهذا قال في الفتح : الحكم في حق العامي فتوى مفتيه، وفي النهاية ويشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة ... ولا معتبر بغيره. اهـ411\2) .. كتاب الصوم)

“সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য ওয়াজিব হল কোন আলেমের তাকলীদ করা, যদি আলেম এমন নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকেন যে, (উক্ত অঞ্চলে) তার ফতোয়া মেনে চলা হয়। ইবনে নুজাইম রহ. এরপর বলেন, ‘এ থেকে বুঝা গেল সাধারণ ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কোন মাযহাব নেই। মুফতীর ফতোয়াই তাদের মাযহাব। ফাতহুল কাদীরে (ইবনুল হুমাম রহ.) বলেন, ‘সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুফতীর ফতোয়াই তার বিধান।’ ‘আন-নিহায়া’তে বলা হয়েছে, ‘শর্ত হচ্ছে, মুফতী এমন ব্যক্তি হতে হবে যার থেকে ফিকহ-ইসলামী আইনশাস্ত্র আহরণ করা হয় এবং এবং ঐ শহরে তার ফতোয়া গ্রহণ করা হয়। ... এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।” **[ফাতাওয়া শামী: কিতাবুস সাওম।]**

এ থেকে বুঝা গেল, যার তার কাছে জিজ্ঞাসা করা যাবে না – যেমনটা আজকাল করা হচ্ছে। মুফতীকে ইলমে ফিকহে এমন পারদর্শী হতে হবে যে, তার থেকে ইলমে ফিকহ শিখা হয় এবং ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে এমন দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে যে, তার ফতোয়া উক্ত এলাকায় মেনে চলা হয়।

যারা খাহেশাতের কারণে কিংবা দুনিয়াবী লাভের উদ্দেশ্যে মাযহাব বদলায় তাদের ব্যাপারে বলেন,

يعزر) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا ... أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع؛ لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة، ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا. أما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه اهـ ملخصا.

“যদি শরীয়তে প্রশংসনীয় কোন উদ্দেশ্য ব্যতীরেকেই বদলিয়ে থাকে তাহলে শাস্তি দেয়া হবে। ... আমার ভয় হয় যে, মৃত্যুর সময় তার ঈমান না’কি চলে যায়। কেননা, সে তার নিজের মাযহাব যা তার বিশ্বাস মতে হক, তার অবমাননা করেছে। পুঁতি-দুর্গন্ধময় আবর্জনা লাভের উদ্দেশ্যে সে তা ত্যাগ করে দিয়েছে। যদি কোন মুজতাহিদ সুস্পষ্ট ইজতিহাদের ভিত্তিতে নিজ মাজহাব তরক করতো তাহলে প্রশংসিত ও সওয়াবপ্রাপ্ত হতো। কিন্তু মুজতাহিদ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কোন প্রকার

দলীল ছাড়াই বরং দুনিয়ার লোভে এবং খাহেশাতের কারণে মাযহাব ত্যাগ করা নিশ্চয় নিন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ, যার ফলে তাকে তা'জীর করা ও শাস্তি দেয়া আবশ্যক। কেননা, সে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিজনক কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং তার ধর্ম ও মাযহাবের অবমাননা করেছে। সংক্ষিপ্তাকারে তাতারখানিয়ার বক্তব্য শেষ হল।" **[ফাতাওয়া শামী: বাবুত তা'জীর]**

বিনা কারণে যারা নিজ মাযহাব বদলায় তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে বলেন,

ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ، ويستوي فيه الحنفي والشافعي وإن انتقل إليه لقلة مبالاته في الاعتقاد والجراءة على الانتقال من مذهب إلى...
مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته ا هـ

"সাধারণ ব্যক্তি এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে যেতে পারবে না। হানাফী-শাফিয়ী সবাই এক্ষেত্রে বরাবর। যদি আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব প্রদানের কারণে এবং দুনিয়াবী লাভের উদ্দেশ্যে মন মত এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে চলে যাওয়ার প্রতি দু:সাহসিকতার কারণে নিজ মাযহাব ত্যাগ করে তাহলে তার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।" **[ফাতাওয়া শামী: কিতাবুশ শাহাদাত।]**

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্য:</u>

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল,

ক. সাধারণ ব্যক্তির জন্য সকল মাসআলায় এক মাযহাব মানা ওয়াজিব- কথাটা নি:শর্তভাবে প্রযোজ্য নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরত ছাড়াই অন্য মাযহাব মানারও অবকাশ আছে।

খ. যার তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা যাবে না এবং কারো কাছে জিজ্ঞাসা ব্যতীত নিজের মন মতোও আমল করা যাবে না। বরং নির্ভরযোগ্য মুফতীর কাছে জিজ্ঞাসা করে আমল করতে হবে।

গ. যে মাসআলায় যে মাযহাব মেনে আসছে কোন জরুরত ছাড়াই উক্ত মাসআলায় উক্ত মাযহাব ত্যাগ করা দ্বীন নিয়ে তামাশার শামিল, যার কারণে ব্যক্তি শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং স্বাক্ষ্য প্রদানের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

একটি অনুরোধ:

তাকলীদের এই মাসআলায় আমি ফতোয়া দিচ্ছি না। আমার কাছে খটকা লেগেছে তাই শুধু আরজ করছি। আপনারা কেউ আমার এই লেখার উপর ভিত্তি করেই অন্য মাযহাব মতে আমল শুরু করতে যাবেন না।

এই লেখার দ্বারা উদ্দেশ্য:

আমার উদ্দেশ্য মুফতী শফী রহ. কিংবা মুফতী তাকি উসমানী দা.বা.কে হেয় করা নয়। আমার খটকাটা শুধু আমি পেশ করেছি। তবে এ কথা অবশ্যই সত্য যে, বড়দের পেশকৃত তাহকীক অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে এমনটা নয়। তাঁদের তাহকীকের উপরও আপত্তি থাকতে পারে। তাঁদের তাহকীকের পরও তাহকীক হতে পারে।

###

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৫৫৭

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০১

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد ...

আল্লাহ তাআলা অপরাধের বিপরীতে শাস্তির বিধান দিয়েছেন। যেন মানুষ শাস্তির ভয়ে অপরাধ থেকে বিরত থাকে। কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় কেউ অপরাধে লিপ্ত হলে তার উপর যথার্থ শাস্তি কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন। যাতে অপরাধী দ্বিতীয়বার অপরাধে লিপ্ত হতে সাহস না পায়। জনগণ যেন তার শাস্তি দেখে শিক্ষা নেয়। এভাবে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল হবে। সমাজের স্বাভাবিক ভারসাম্যতা বজায় থাকবে। সমাজে শান্তি ও সুশৃংখলতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে এই শাস্তি সবক্ষেত্রে এক রকম নয়। অপরাধের ধরণ ও পরিমাণ, অপরাধীর অবস্থা, যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে তার অবস্থা- ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্নতায় শাস্তির ধরণ-প্রকৃতি ও পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে।

এক. অপরাধের ভিন্নতায় শাস্তির ভিন্নতা

যেমন:

- যিনার শাস্তি: বিবাহিত হলে রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা আর অবিবাহিত হলে একশো দোররা।

- কোন পূত-পবিত্র স্বাধীন মুসলমানকে যিনার অপবাদ দিলে আশি দোররা।

- মদপানে আশি দোররা।

- চুরি করলে হাত কাটা।

- রাহাজানি করলে অবস্থাভেদে হত্যা, শূলিতে চড়ানো, কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়া, কিংবা জেলে ভরা বা নির্বাসন দেয়া।

- হত্যার বদলে হত্যা বা দিয়াত (রক্ত-মূল্য)।

- মুরতাদ হয়ে গেলে হত্যা।

দুই. অপরাধীর অবস্থাভেদে শাস্তির ভিন্নতা

যেসব অপরাধের শাস্তি শরীয়তে সুনির্ধারিত নয় (যেমন- পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, কাউকে গালি দেয়া), সেসব অপরাধের শাস্তি ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- কোন দ্বীনদার ব্যক্তি যদি জীবনের প্রথম কাউকে গালি দেয়, তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া যেতে পারে। যেমনটা হাদিসে এসেছে- **أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود** "বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হদ ব্যতীত অন্যান্য ভুল-বিচ্যুতি মাফ করে দাও।" কিংবা তাকে যদি কাযি সাহেব লোক মারফত জানান যে, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে: আপনি অমুককে গালি দিয়েছেন- তাহলে এতটুকুই তার এ অপরাধের শাস্তির জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি গালি-গালাজ এবং মারামারিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, লোকজন তার যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে যায়- তাহলে এমন ব্যক্তিকে মাফ করা হবে না। তাকে শুধু মৌখিক জানানোও যথেষ্ট নয়। বরং তাকে গ্রেফতার করে কাযির দরবারে হাজির করতে হবে। প্রয়োজনে প্রহার করতে হবে। জেলে আটকে রাখতে হবে, যত দিন না তাওবা করে সংশোধন হয়। তদ্রূপ কোন দ্বীনদার ব্যক্তি যদি কোন নিরপরাধ মুসলমানকে মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফেলে, তাহলে জীবনের প্রথমবার করলেও তার এ অপরাধ ক্ষামাযোগ্য নয়। তাকে শুধু জানানোও যথেষ্ট নয়। বরং তাকে প্রয়োজন পরিমাণ বেত্রাঘাত করাই এখন তার যোগ্য শাস্তি। কেননা, তার এ অপরাধ আর ভুল-বিচ্যুতির পর্যায়ে থাকেনি (হাদিসে যা ক্ষমা করে দেয়ার কথা এসেছে) বরং তা মাত্রা অতিক্রম করে সীমালংঘন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

তিন. যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে, তার অবস্থাভেদে শাস্তির ভিন্নতা

কোন সাধারণ লোক যদি অন্য কোন সাধারণ লোককে গালি দেয়, তাহলে তার শাস্তি হবে এক রকম। পক্ষান্তরে এমন ব্যক্তি কোন বিশিষ্ট আলেমকে গালি দিলে তার শাস্তি হবে আরও শক্ত। তদ্রূপ কোন নষ্টা মেয়ের সাথে ইভটিজিং করার শাস্তির তুলনায় কোন সম্ভ্রান্ত, দ্বীনদার ও পর্দানশীল নারীর সাথে এ ধরণের কর্মের শাস্তি আরও গুরুতর হবে। এভাবে অপরাধ ও অপরাধী এক হওয়া সত্ত্বেও যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে, তার অবস্থাভেদে শাস্তি ভিন্ন হয়।

পোস্টের লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০২২৩

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০২

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৭-২৭-২০১৮

হদ (الحد)-তা'যির (التعزير)

শরীয়তে শাস্তি ও দণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত:

১. কিছু শাস্তি শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত, যাতে কোন ধরণের কম-বেশ করা যাবে না। এগুলোকে হদ বলে। আর কিছু শাস্তির সুনির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই। অপরাধের ধরণ ও পরিমাণ, অপরাধীর অবস্থা, যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে তার অবস্থা- ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্নতায় সেগুলো বিভিন্ন রকম ও পরিমাণের হয়ে থাকে। শরয়ী ইমাম, সুলতান বা কাযি যেখানে শরীয়ত সম্মত যে ধরণের ও যে পরিমাণের শাস্তি দেয়া মুনাসিব মনে করেন, ইজতিহাদের ভিত্তিতে সে রকম শাস্তি প্রয়োগ করবেন। যেখানে যে শাস্তি প্রয়োগ করলে অপরাধ দমন হবে বলে মনে হয়, সেখানে সে শাস্তিই প্রয়োগ করবেন। অবশ্য তা শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত শাস্তি তথা হদের কম হতে হবে। এ ধরণের শাস্তিকে তা'যির বলে। নিচে আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে হদ ও তা'যির নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

হদ (الحد)

আভিধানিকভাবে **الحد** অর্থ- **المنع** তথা বাধা দেয়া। এসব শাস্তিকে হদ বলা হয়, কারণ- এগুলো লোকজনকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে। লোকজন যখন জানবে যে- যিনা, কযফ (তথা কোন পূত-পবিত্র স্বাধীন মুসলমানকে যিনার অপবাদ দেয়া), চুরি ইত্যাদির ব্যাপারে শরীয়তে নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে, তখন সচরাচর তারা এসব অপরাধে লিপ্ত হতে সাহস করবে না। কেউ এসব অপরাধের কোন একটাতে লিপ্ত হলে যখন তার উপর এর শাস্তি কায়েম

করা হবে তখন সে আর পুনর্বার তাতে লিপ্ত হতে সাহস করবে না। তদ্রূপ জনসাধারণ যখন অপরাধীর উপর এসব শাস্তি কায়েম হচ্ছে দেখবে, তখন তারাও এগুলোতে লিপ্ত হওয়ার সাহস করবে না। মোটকথা- এসব শাস্তি লোকজনকে এসব অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে এগুলোকে হদ বলা হয়।

আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

الحد في اللغة : عبارة عن المنع ... وفي الشرع : عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى - عز شأنه . اهـ

"অভিধানে হদ অর্থ- বাধা দেয়া। ... আর শরীয়তের পরিভাষায় হদ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ফরযকৃত সুনির্ধারিত শাস্তি।" **[বাদায়িউস সানায়ে': ৫/৪৮৬]**

ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০হি.) বলেন,

الحد في اللغة المنع ... وسميت العقوبات الخالصة حدودا لأنها موانع من ارتكاب أسبابها معاودة. اهـ

"অভিধানে হদ অর্থ- বাধা দেয়া। ... খালেস শাস্তিসমূহকে হদ বলা হয় কারণ, যেসব কারণে এসব শাস্তি বর্তায়, এগুলো পুনর্বার সেগুলোতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।" **[আলবাহরুর রায়েক: ৫/৩]**

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

تحقيق العبارة ما قال بعض المشايخ: إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده. أي : العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، و إيقاعها بعده يمنع من العود إليه . اهـ

"তাহকিকি কথা হচ্ছে যা কোন কোন মাশায়িখ বলেছেন যে, 'লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এগুলো (লিপ্ত হওয়া থেকে) বাধা দান করে আর লিপ্ত হওয়ার পর (পুনর্বার লিপ্ত হওয়া থেকে) বারণ রাখে।' অর্থাৎ শরীয়তে এসব শাস্তির বিধান রয়েছে বলে জানা থাকাটা সেগুলোতে লিপ্ত হতে বাধা দেয়, আর লিপ্ত হওয়ার পর এগুলো প্রয়োগ

করাটা সেগুলোতে পুনর্বার লিপ্ত হওয়া থেকে বারণ রাখে।" **[ফাতহুল কাদির: ৫/১৯৬]**

হদের সংজ্ঞায় মৌলিকভাবে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে:

১. **عقوبة** তথা শাস্তি।

২. **مقدرة** তথা সুনির্ধারিত।

৩. **حقا لله تعالى** তথা আল্লাহ তাআলার হক।

অতএব, হদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস থাকবে-

প্রথমত তা শাস্তি হবে। কাজেই নামায, রোযা- ইত্যাদির কাফফারা সুনির্ধারিত হলেও সেগুলো হদ নয়। কেননা সেগুলো খালেস শাস্তি নয়। সেগুলোতে ইবাদত ও শাস্তি উভয় দিকই রয়েছে।

দ্বিতীয়ত শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত হবে। এ শর্তের দ্বারা তা'যিরসমূহ হদের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা, সেগুলো শাস্তি হলেও শরীয়ত কতৃক সেগুলোর ধরণ ও পরিমাণ সুনির্ধারিত নয়। বরং অবস্থাভেদে তা বিভিন্ন রকম হয়।

তৃতীয়ত তা আল্লাহ তাআলার হক হবে। আল্লাহ তাআলার হক হওয়ার অর্থবান্দাদের কেউ সেগুলো মাফ করতে পারবে না। অর্থাৎ উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর কেউ সেগুলো মাফ করতে পারবে না। ইমামুল মুসলিমীনেরও সে অধিকার, নেইঅন্য কারও সে অধিকার নেই। যেমন- চার সাক্ষী দিয়ে কাযির দরবারে যিনা প্রমাণ হওয়ার পর যিনাকারকে মাফ করার কোন সুযোগ নেই। বিবাহিত হলে রজম করতে হবে আর অবিবাহিত হলে একশো দোররা লাগাতে হবে।

(আল্লাহর হক ও বান্দার হক নিয়ে সামনে ইনশাআল্লাহ আলোচনা আসবে।)

এ শর্তের দ্বারা হদের সংজ্ঞা থেকে কেসাস তথা হত্যার বদলে হত্যা বেরিয়ে যাবে। কেননা হত্যার বদলে হত্যা যদিও সুনির্ধারিত, কিন্তু সেটা বান্দার হক। নিহত ব্যক্তির অভিবাবকগণ ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে হত্যা না করে বা দিয়াত না নিয়ে মাফও করে দিতে পারেন। কিন্তু হদ তার ব্যতিক্রম। প্রমাণ হওয়ার পর তা মাফ করার কোন সুযোগ নেই।

কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

وفي الشرع : عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى - عز شأنه - بخلاف التعزير فإنه ليس بمقدر ، قد يكون بالضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بغيرهما ، وبخلاف القصاص فإنه وإن كان عقوبة مقدرة لكنه يجب حقا للعبد ، حتى يجري فيه العفو والصلح. اهـ

"শরীয়তের পরিভাষায় হদ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ফরযকৃত সুনির্ধারিত শাস্তি। কিন্তু তা'যির এমন নয়। কেননা, সেটা সুনির্ধারিত না। কখনো প্রহারের দ্বারা হয়, কখনো বন্দী করে রাখার দ্বারা হয় আবার কখনো অন্য কিছু দিয়ে হয়। তদ্রূপ কেসাসও এর ব্যতিক্রম। কেননা, সেটা সুনির্ধারিত শাস্তি হলেও তা বান্দার হক হিসেবে ফরয হয়। ফলে তাতে মাফ করে দেয়া কিংবা (বিনিময় নিয়ে) চুক্তি করা চলে।" **[বাদায়িউস সানায়ে': ৫/৪৮৬]**

মুহাম্মাদ থানবী হানাফী রহ. (১১৫৮হি.) বলেন,

وعند الفقهاء: عقوبة مقدرة تجب حقّا لله تعالى. فلا يسمّى القصاص حدّا لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير. والمراد بالعقوبة هاهنا ما يكون بالضرب أو القتل أو القطع فخرج عنه الكفّارات، فإنّ فيها معنى العبادة والعقوبة. اهـ

"ফুকাহায়ে কেরামে পরিভাষায় হদ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ফরযকৃত সুনির্ধারিত শাস্তি। কাজেই কেসাসকে হদ বলা হয় না। কেননা, সেটা বান্দার হক। তা'যিরকেও না। কারণ, সেটা সুনির্ধারিত নয়। এখানে শাস্তির দ্বারা উদ্দেশ্য- যা প্রহার, হত্যা বা কর্তনের মাধ্যমে হবে। কাজেই কাফফারাসমূহ এ থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা, সেগুলোতে ইবাদত-শাস্তি উভয় দিকই রয়েছে।" **[কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলূম: ১/৬২৩]**

পোস্টের লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০২৫৫

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৩

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৭-৩১-২০১৮

হদের প্রকারভেদ

হানাফি মাযহাবে ছয় প্রকার অপরাধের শাস্তি হদের অন্তর্ভুক্ত:

১. যিনা।

২. মদপান।

৩. মদ ব্যতীত অন্য কোন নেশাজাত দ্রব্য সেবনে মাতাল হয়ে পড়লে। অবশ্য এর শাস্তি মদপানের শাস্তির সমান তথা আশি দোররা।

৪. কজফ তথা পূত-পবিত্র কোন স্বাধীন মুসলমানকে যিনার অপবাদ দেয়া।

৫. চুরি।

৬. রাহাজানি।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (১২৫২হি.) ইবনে কামাল পাশা রহ. (৯৪০হি.) থেকে বর্ণনা করেন,

وهي ستة أنواع: حد الزنا، وحد شرب الخمر خاصة، وحد السكر من غيرها والكمية متحدة فيهما، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قطع الطريق. اهـ

"হদ ছয় প্রকার: ১. যিনার হদ। ২. মদপানের হদ। ৩. মদ ব্যতীত অন্য কোন মাদক সেবনে মাতাল হওয়ার হদ। তবে শাস্তির পরিমাণ উভয়টাতে একই। ৪. কজফ তথা যিনার অপবাদ লাগানোর হদ। ৫. চুরির হদ। ৬. রাহাজানির হদ।" [রদ্দুল মুহতার: ৪/৩]

হদসমূহের উপর কিঞ্চিত আলোকপাত

১. যিনা

যিনার শাস্তি: অবিবাহিত হলে একশো বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে রজম তথা প্রস্তারাঘাতে হত্যা। বেত্রাঘাত কোরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা, আর রজম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

"যিনাকারী পুরুষ ও যিনাকারী নারী: প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখ, তাহলে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মু'মিনদের একটা দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" **[**নূর: ২**]**

হাদিসে এসেছে,

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة.

"যে মুসলমান স্বাক্ষী দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল; তিন কারণের কোন একটা ব্যতীত তার রক্ত হালাল নয়: জানের বদলায় জান, বিবাহিত যিনাকার এবং মুসলমানদের জামাআত পরিত্যাগকারী দ্বীনত্যাগী (মুরতাদ)।" **[**সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬৪৮৪ , সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৪৬৮**]**

ইসলামে রজমের বিধান শুরু হয় ইয়াহুদিদের দিয়ে। দুই ইয়াহুদি নারী-পুরুষ যিনা করে। ইয়াহুদিরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার নিয়ে আসে। তিনি তাদের উভয়কে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করেন এবং বলেন,

اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه

"হে আল্লাহ! তারা যখন তোমার আদেশ মিটিয়ে দিয়েছে, তখন সর্ব প্রথম আমি তা যিন্দা করলাম।" **[**সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাবু রজমিল ইয়াহুদ; সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাবুররজমি ফিল বালাত্ব।**]**

মায়িয আলআসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনা করে ফেলেন। তিনি তাওবা করে লজ্জিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজ অপরাধ স্বীকার করে হদ কায়েম করতে বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তিনি বার বার হদ কায়েমের জন্য আবেদন করতে থাকেন। এভাবে চার বার করার পর তিনি রজমের আদেশ দেন। ফলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হয়। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাব: আর-রজমু বিল মুসাল্লা; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।]

জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা যিনা করে ফেলেন। তিনি তাওবা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হদ কায়েমের আবেদন জানান। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মায়িয আলআসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো তাকেও রজম করে হত্যা করেন। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।]

এক লোক এক বাড়িতে কর্মচারি ছিল। সে বাড়ির মালিকের স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর হদ কায়েম করেন। কর্মচারি লোকটি অবিবাহিত ছিল তাই তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেন। আর মালিকের স্ত্রী বিবাহিত হওয়ায় তাকে রজম করে হত্যা করেন। [সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতিল্লাতি লা তাহিল্লু ফিলহুদুদ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।]

উল্লেখ্য যে, হানাফি মাযহাব মতে উক্ত নির্বাসন হদ হিসেবে নয়, সিয়াসত হিসেবে। ইমামুল মুসলিমিন যদি কাউকে নির্বাসন দেয়া উচিৎ মনে করেন তাহলে দিতে পারেন। অন্যথায় নির্বাসন দেয়া জরুরী নয়। আর যদি নির্বাসন দিতে গেলে উক্ত লোক মুরতাদ হয়ে যাওয়ার বা গোমরাহ হয়ে যাওয়ার বা অন্যদের ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে কিংবা অন্য কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে তাহলে নির্বাসন দেয়া উচিৎ হবে না। [দেখুন : শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবি, ৬/১৬২-১৬৩; বাদায়িউস সানায়ি': ৫/৪৯৬]

যিনা কিভাবে প্রমাণ হবে?

যিনা প্রমাণ হতে চার জন আদেল-ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। মহিলাদের সাক্ষ্য হদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}

"তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ (তথা যিনা) করে, তাদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্য হতে চার জন্য সাক্ষী রাখ।" [নিসা: ১৫]

তবে যিনাকার ব্যক্তির নিজের স্বীকারোক্তির দ্বারা যিনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, যদিও অন্য কোন সাক্ষী না থাকে। তবে স্বীকারোক্তি কতবার লাগবে সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফি মাযহাব মতে চার মজলিসে চার বার স্বীকারোক্তি লাগবে। যেমন- হযরত মায়িয আলআসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার মজলিসে চার বার স্বীকারোক্তি নিয়েছেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০২৮২

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৪

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-০৬-২০১৮

২. কযফ তথা যিনার অপবাদ আরোপ

কোন পূত-পবিত্র স্বাধীন মুসলমান নারী বা পুরুষের উপর যিনার অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারীকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। অপবাদ আরোপকারীকে চার জন আদেল সাক্ষী দিয়ে যিনা প্রমাণ করতে বলা হবে। যদি প্রমাণ না করতে পারে তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। আর হানাফি মাযহাব মতে ভবিষ্যতে সারা জীবনের জন্য তার সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা বাতিল হয়ে যাবে। তাই আর কখনোও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ}

"যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসতে পারে না: তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসেক। তবে যারা এরপরে তাওবা করে এবং নিজদের সংশোধন করে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" নূর: ৪-৫

মুনাফিকরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করেছিল। তিন জন সরল-সহজ মুসলমানও তাদের ফাঁদে পড়ে তাদের সাথে তাল মিলিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে সূরা নূরের শুরুর দিকে দশটি আয়াত নাযিল করে উম্মুল মু'মিনীনের পবিত্রতা ঘোষণা

করেন। সেখানে অপবাদ আরোপকারীদেরকে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}

"তারা এ বিষয়ে কেন চার জন সাক্ষী উপস্থিত করল না? যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ তাআলার নিকট তারা নিজেরাই মিথ্যাবাদি।" নূর: ১৩

আয়াত নাযিল হওয়ার পর যেসব মুসলমান অপবাদে শরীক ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হদ্দে কযফস্বরূফ আশি করে বেত্রাঘাত লাগান। [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্: কিতাবুল হুদুদ, বাব: হদ্দুল কযফ।]

হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যিনায় লিপ্ত হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك.

"চার সাক্ষী উপস্থিত কর, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ বর্তাবে।" [নাসায়ী, বাব: কাইফাল লিআন। আরও দেখুন- তিরমিযি: তাফসীরে সূরা নূর; আবু দাউদ, বাব: ফিল-লিআন।]

কযফ কিভাবে প্রমাণ হবে?

সাক্ষী বা অপবাদ আরোপকারীর নিজ স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রমাণ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যিনার মতো চার পুরুষ বা চার বার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। দুই জন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য কিংবা অপবাদ আরোপকারীর এক বার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। অর্থাৎ দুই জন আদেল পুরুষ যদি কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক পূত-পবিত্র মুসলমানকে যিনাকারী বলেছে কিংবা ব্যক্তি যদি নিজেই কাযির কাছে স্বীকার করে যে, সে অমুক পূত-পবিত্র মুসলমানকে যিনাকারী বলেছে তাহলেই সে অপবাদ আরোপকারী সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এখন যদি সে চার জন সাক্ষী দিয়ে যিনা

প্রমাণ না করতে পারে, তাহলে হদ্দে কযফরূপে তাকে আশিটি বেত লাগানো হবে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রেও মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৩-৪. মদ পান ও মাদক সেবন

এ উভয়টির শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। তবে মদের ক্ষেত্রে কম পান করুক কি বেশি পান করুক, নেশা আসুক বা না আসুক- সর্বাবস্থায় হদ লাগানো হবে। আর মদ ব্যতীত অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি এ পরিমাণ সেবন করে যে, যার কারণে নেশা এসে গেছে- তাহলে হদ লাগানো হবে, অন্যথায় নয়। তবে হদ না লাগানোর অর্থ এই নয় যে, তা সেবন করা জায়েয। সেবন সর্বাবস্থায়ই নাজায়েয। তবে হদ কায়েমের জন্য নেশা আসা শর্ত। কিন্তু মদের ক্ষেত্রে নেশা আসা শর্ত নয়। মদ পান করাই হদ কায়েমের জন্য যথেষ্ট, নেশা আসুক বা না আসুক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পানকারীকে চল্লিশ বেত লাগাতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এর উপরই আমল করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় যখন লোকজনের মাঝে মদ পানের পরিমাণ বেড়ে গেল, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন- কি করা যায়? সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে আশি বেত্রাঘাত শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত হয়।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পক্ষে এই যুক্তি দেন যে, হদের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল- আশি বেত্রাঘাত। কেননা, যিনার শাস্তি একশো দোররা আর হদ্দে কযফের শাস্তি আশি দোররা। এর নিচে কোন হদ নেই। তিনি বলেন, এ সর্বনিম্ন হদকেই মদ পানের শাস্তি নির্ধারণ করা হোক।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন ব্যক্তি মদ পান করলে মাতাল হয়ে যায়। মাতাল হলে বেহুদা কথা-বার্তা ও গালি-গালাজ শুরু করে। গালি-গালাজের এক পর্যায়ে কাউকে যিনার অপবাদও আরোপ করতে পারে। আর এর শাস্তি আশি দোররা। অতএব, মদ পান যেহেতু কযফ তথা অপবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে, তাই এর শাস্তি কযফের শাস্তির অনুরূপ হতে পারে। এ পরামর্শদ্বয় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পছন্দ হল। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও তাতে সম্মতি দিলেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরামের সম্মতির ভিত্তিতে মদ্য পানের শাস্তি নির্ধারিত হয় আশি বেত্রাঘাত। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাব: হদ্দুল খমর, বাব: আয-যারবু

বিলজারিদি ওয়াননিআল; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: হদ্দুল খমর; মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, বাব: আলহদ্দু ফিলখমর।]

মদ্যপান কিভাবে প্রমাণ হবে?

হদ্দে কযফের মতোই দুই জন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য কিংবা মদ্যপানকারী নিজের স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রমাণ হবে। তবে স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে শর্ত হলো- তা স্বাভাবিক হুঁশ থাকা অবস্থায় হতে হবে। মাতাল অবস্থায় যদি স্বীকার করে যে, সে মদপান করেছে তাহলে তা ধর্তব্য নয়।

এ দুই ত্বরীকা ভিন্ন মদ্যপান প্রমাণিত হওয়ার আর কোন ত্বরীকা নেই। কাজেই কারো ঘরে বা দোকানে বা কারো সাথে যদি মদ পাওয়া যায়, তাহলে তার উপর মদ্যপানের হদ কায়েম করা যাবে না। তবে তার কাছে মদ পাওয়া যাওয়ার কারণে মুনাসিব মতো অন্য শাস্তি দেয়া হবে।

পোস্টের লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৩২৯

অঙ্গবিকৃতি (المثلة) কখন অবৈধ?

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-১২-২০১৮

হাদিসে অঙ্গ বিকৃতি করতে নিষেধ এসেছে। আরবীতে যাকে المثلة বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্যে- কাউকে হত্যা করতে গিয়ে তার হাত-পা, নাক-কান-চোখ ইত্যাদি কর্তন করা বা নষ্ট করা। যেমন বুখারী শরীফে এসেছে-

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة"

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুণ্টন ও অঙ্গবিকৃতি থেকে বারণ করেছেন।” [সহীহ বুখারী: ২৩৪২]

তবে এ নিষেধাজ্ঞা বন্দী কাফেরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাফের বন্দী হওয়ার পর তাকে স্বাভাবিক হত্যা করতে বলা হয়েছে। তখন ইচ্ছাকৃত তার অঙ্গ বিকৃত করা নিষেধ। নাক-কান কাটা, চোখ নষ্ট করা, হাত-পা কাটা বা নষ্ট করা: এসব করা যাবে না। অবশ্য এখানেও আইম্মায়ে কেরামের মতভেদ আছে।

পক্ষান্তরে যুদ্ধরত কাফের, যাদের সাথে এ মূহুর্তে মারামারি চলছে বা যেসব কাফেরকে আমরা বন্দী করতে পারিনি- তাদেরকে হত্যা, বন্দী বা কাবু করার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গবিকৃতি বৈধ। যেমন- প্রথমে সুযোগ বুঝে আঘাত করে চোখ নষ্ট করে ফেলা তারপর হত্যা বা বন্দী করা।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

ثم لا يخفى أن هذا بعد الظفر والنصر، أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقأ عينه فلم ينته فضرب فقطع أنفه ويده ونحو ذلك. اهـ

“অস্পষ্ট নয় যে, নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র হলো- কাবু করতে সক্ষম হওয়া ও জয় লাভের পর। পক্ষান্তরে এর আগে মারামারি অবস্থায় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যেমন, প্রতিদ্বন্দী (মুসলিম) যোদ্ধা এক আঘাতে প্রতিপক্ষ যোদ্ধার কান কেটে ফেলল। অপর আঘাতে চোখ নষ্ট করে ফেলল। এরপরও যখন সে বিরত হল না, তখন আরেক আঘাতে তার নাক ও হাত কেটে দিল। এছাড়াও এ ধরণের যেকোন অঙ্গবিকৃতি (তে কোন সমস্যা নেই)।" [ফাতহুল কাদীর: ৫/৪৫২]

মোটকথা: যাকে আমরা বন্দী করেছি, এখন স্বাভাবিকভাবে তাকে হত্যা করতে পারি- তাকে স্বাভাবিক হত্যা করবো। আর যাকে বন্দী করতে পারিনি- চাই তার সাথে মারামারি চলুক বা না চলুক- তাকে হত্যা, বন্দী বা কাবু করার জন্য যেকোন স্থানে আঘাত করে যেকোন অঙ্গ কর্তন বা নষ্ট করা জায়েয।

অতএব, তাগুত বাহিনির কোন সদস্যের সাথে যদি কোন মুজাহিদ ভাইয়ের মারামারি বেঁধে যায়, তাহলে তিনি তাকে হত্যা বা কাবু করার জন্য বা তার থেকে নিরাপদে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যেকোন জিনিস দ্বারা যেকোন স্থানে আঘাত করে যেকোন অঙ্গ কর্তন বা নষ্ট করতে পারবেন। তদ্রূপ, রাস্তা-ঘাটে চলন্ত বা সেনাঘাটিতে বা বাড়িতে প্রহরারত বা বিশ্রামরত যেকোন তাগুতী সদস্যকে হত্যা, বন্দী বা কাবু করার জন্য যেকোন জিনিস দিয়ে যেকোন স্থানে আঘাত করে নষ্ট ও বিকৃতি ঘটানো যাবে।

পোস্টের লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৩৭৭

সাহাবায়ে কিরাম রা:ই আমাদের আদর্শ

Sabet

Member

৮-১৯-২০১৮

কোরআন, সুন্নাহ হলো শরীয়তের দলীল,আর সাহাবায়ে কেরাম হলো শরীয়তের মাপকাঠি। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওঃ মাওদুদী সাহেব সাহাবায়ে কেরামকে মাপকাঠি মানেননা। তিনি বলেন **فهم رجال ونحن رجال** তাঁরাও মনুষ, আমরাও মানুষ। অর্থাৎ তাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। এটা তার একটি গুমরাহী।

কারণ আল্লাহতালা সূরা বাক্বারার ১৩ নাম্বার আয়াতে ইরশাদ করেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।

এ আয়াতে আল্লাহতায়ালা সাহাবায়ে কেরামের মত ঈমান আনতে বলেছেন।

এবং সূরা হুজরাতের ৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহতালা ইরশাদ করেন

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ

তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

এ আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের ঈমান,পবিত্রতা,নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা ও হেদায়েতের উপর থাকার সনদপত্র আল্লাহতালা দিয়েছেন।

সূরায়ে বাক্বারার ১৩৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহর রাব্বুল আলামীন বলেন:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। এ আয়াতে 'তোমরা'অর্থ সাহাবাগণ রা:।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

٧] عن عبدالله بن عمرو:] لَيأْتِيَنَّ على أمتي ما أتَى على بني إسرائيلَ حذْوَ النعلِ بالنعلِ حتى إنْ كان منهم من أتى أمَّهُ علانِيَةً لكانَ في أمَّتِي من يصنَعُ ذلِكَ . وإنَّ بني إسرائيلَ تفرقَتْ على ثنتينِ وسبعينَ مِلَّةً، وتفْتَرِقُ أمتي على ثلاثٍ وسبعينَ ملَّةً كلُّهم في النارِ إلَّا ملَّةً واحدَةً، قال من هِيَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي الترمذي (٢٧٩ هـ)، سنن الترمذي ٢٦٤١ •غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه •أخرجه الترمذي (٢٦٤١) واللفظ له، والطبراني (٥٣/١٤) (١٤٦٤٦)، والحاكم (٤٤٤

আমার উম্মত ঐসব অবস্থার সম্মুখিন হবে, যা বনী-ইসরাঈল সম্মুখীন হয়েছিলো,ঠিক একজোড়া জুতার একটি-অপরটির মতো। এমনভাবে যে,যদি তাদের কেউ নিজের মায়ের সাথে জ্বিনা করে থাকে তবে আমার উম্মতের মধ্যেও লোক থাকবে,যে নিজের মায়ের সাথে জ্বিনা করে। আর বনী ইসরাঈল বাহাত্তরটি ভাগে ভাগ হয়েছিলো,আমার উম্মত তেহাত্তর ভাগে ভাগ হবে। তাদের প্রত্যেকে

জাহান্নামী হবে,শুধুমাত্র একটি ভাগ(মিল্লাত) ছাড়া। সাহাবীগণ রা: জিজ্ঞেস করলেন,''তারা কারা' হে আল্লাহর রাসূল?"তিনি বললেন, যারা আমি যে পথে আছি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে (সে পথ অনুসরণ করবে) সুনানে তিরমিযী

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন:

قَالَ عبد الله بن مسعود ﷺ "من كان منكم مستنا فاليستن بمن قد مات.فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد:أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علما و أقلها تكلفا قوم اختار هم الله لصحبة نبيه و إقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم"

তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যকে উদাহরণ হিসাবে নিতে চায়, সে যেন যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাদের থেকে উদাহরণ নেয়।কারণ যে জীবিত,সে ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা নেই।তাঁরা হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ রা:।এই উম্মতের মধ্যে তারা সবচেয়ে খোদাভীরু,সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী,বাড়াবাড়ি ও অলসতা হতে সবচেয়ে দূরে।তাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর রাসূল সা:এর সঙ্গী হওয়ার জন্য এবং তাঁদের মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন।তাই তাঁদের সম্মান ও অধিকারের স্বীকৃতি দাও।এবং তাদের পথ আঁকড়ে ধরো।কারণ তাঁরা সঠিক পথের উপর ছিলেন।

আমাদের ইমামে আজম আবুহানিফা র: বলেছেন:

قالالإمام أبو حنيفة: ما جاء عن الله تعالي فعلي الرأس والعينين. ،وما جاء عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فسمعًا وطاعة، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخيّرنا من أقوالهم، ولم نخرج عنهم ، وماجاء من التابعين فهم رجال ونحن رجال،]الإحكام لابن حزم ٣٧٥/٤[

আল্লাহর কাছ থেকে যা এসেছে তা আমাদের মাথা ও দু'চোখের উপর,আর যা এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সে ব্যাপারে হলোঃ শুনা ও মানা, যে সকল কথা সাহাবা গন (রা.) থেকে এসেছে আমরা সেগুলোর মাঝে

যাচাই-বাছাই করবো কিন্তু সেগুলোর বাইরে যাবো না। আর তাবেয়ীনদের কাছ থেকে যা এসেছে, সে ব্যাপারেঃ তারাও মানুষ আমরা ও মানুষ।

মুহতারামহাজেরীন:উল্লেখিত আয়াত,হাদিস,সাহাবীর(রা)বক্তব্য,ও আবু হানিফার: এর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাগেলো যে, কোরআন,হাদিস ও সাহাবাগণ ছাড়া আর কেউ শরিয়তের দলীল বা মাপকাঠি হতে পারেনা।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৪৪৬

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৭: এক. বয়কট ও বর্জন

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১২-২০১৮

কোরআন হাদিসে বিভিন্ন প্রকারের তা'যিরের কথা এসেছে। ফুকাহায়ে কেরাম তা'যিরে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. বর্জন ও বয়কট।

২. নির্বাসন।

৩. বন্দী করে রাখা।

৪. প্রহার।

৫. হত্যা ... ইত্যাদি।

এক. বর্জন ও বয়কট

কেউ কোন হারাম কাজে লিপ্ত হলে কিংবা কোন ফরয-ওয়াজিব ছেড়ে দিলে, মুনাসিব মনে হলে তাকে বর্জন ও বয়কটের মাধ্যমে তার শাস্তি হতে পারে। কোরআনে কারীমে স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর ব্যাপারে এই শাস্তির কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

"যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদেরকে (প্রথমে) বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় শয়ন ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদের প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। নিশ্চিত জেনো- আল্লাহ সবার উপরে, সবার বড়।" [নিসা: ৩৪]

বুঝিয়ে কাজ না হলে আল্লাহ তাআলা অবাধ্য স্ত্রীর বিছানা স্বামী থেকে আলাদা করে দিতে বলেছেন। এতেও কাজ না হলে প্রহারের বৈধতা দিয়েছেন। এটা তার অবাধ্যতার শাস্তি।

এ আয়াতে কারীমাটি তা'যিরের অধ্যায়ে একটি মৌলিক দলীলরূপে বিবেচ্য। এখান থেকে কয়েকটি বিধান জানা যায়:

- হুকুকুল্লাহ বা হুকুকুল ইবাদ- এর যে কোনটার সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ, যেগুলোর কারণে সমাজে বিশৃংখলা বা সমাজের লোকজনের কষ্ট হতে পারে, সেগুলোর বিপরীতে তা'যির করা যাবে। কেননা, স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা স্বামীকে তা'যিরের অধিকার দিয়েছেন; অথচ স্ত্রীর অবাধ্যতার কষ্ট শুধু স্বামী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, তাহলে যেসকল অপরাধের কারণে সমাজ নষ্ট হবে, জনগণের কষ্ট হবে; সেগুলোর কারণে তো এর আগেই শাস্তি জায়েয হবে, যাতে অপরাধী দমন হয় এবং সমাজে বিশৃংখলা না হয়, লোকজন কষ্ট থেকে রেহাই পায়।

- তা'যিরের ক্ষেত্রে ক্রমানুবর্তিতা গ্রহণ করতে হবে। অল্পতে কাজ হলে বেশি দেয়া যাবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা প্রথমেই বিছানা পৃথক করার কিংবা প্রহার করার বৈধতা দেননি। প্রথমে বুঝাতে বলেছেন। কাজ না হলে তখন বিছানা পৃথক করতে বলেছেন। তাতেও কাজ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে প্রহারের বৈধতা দিয়েছেন। এই ক্রমানুবর্তিতার বিধান সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

وهو مشروع بالكتاب، قال الله تعالى {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34] أمر بضرب الزوجات تأديبا وتهذيبا. اهـ

"তা'যিরের বৈধতা কোরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, [তাদেরকে (প্রথমে) বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় শয়ন ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদের প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না।] শিষ্টাচার ও সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদের প্রহার করার আদেশ দিয়েছেন।" [ফাতহুল কাদির: ৫/৩৪৫]

ইবনুল উখুওয়্যাহ্ রহ. (হি.৭২৯) বলেন,

ولأن الله - تعالى - أباح الضرب للزوج عند نشوز الزوجة وقسنا عليه سائر المعاصي على حسب ما يراه الإمام أو نائبه. اهـ

"তাছাড়া স্ত্রীর অবাধ্যতায় আল্লাহ তাআলা স্বামীকে প্রহারের বৈধতা দিয়েছেন। অন্য সকল অপরাধকে আমরা এর উপর কিয়াস করতে পারি। ইমাম বা তার নায়েব যেমনটা মুনাসিব মনে করেন, শাস্তি দেবেন।" [মাআলিমুল ক্বুরবাহ্: ১/২৫০]

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

إذا خاف نشوزها وعظها فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع فإن قبلت وإلا ضربها. اهـ

"যখন স্ত্রীর থেকে অবাধ্যতার আশঙ্কা করবে- তাকে বুঝাবে। যদি গ্রহণ করে তো ভালই, অন্যথায় তাকে বিছানায় পরিত্যাগ করবে। যদি গ্রহণ করে তো ভালই, অন্যথায় প্রহার করবে।" [আহকামুল কোরআন: ২/২৩৮]

হাদিস শরীফেও বয়কটের নজীর রয়েছে। গযওয়ায়ে তাবুকে তিনজন সাহাবী শরীক হননি। তারা হলেন- কা'ব ইবনে মালেক রাদি., হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদি. ও মুরারাহ্ ইবনে রবী' রাদি.। সাহাবায়ে কেরামসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাদেরকে পঞ্চাশ দিন বয়কট করে রেখেছিলেন। পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের তাওবা কবুল করে তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"এবং সেই তিন জনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন) যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখা হয়েছিল। অবশেষে যখন এ পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠল এবং

তারা উপলব্ধি করল- আল্লাহর পাকড়াও থেকে স্বয়ং তার আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না: তখন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে তারা তারই দিকে মনোনিবেশ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [তাওবা: ১১৮]

ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (হি.৬৫৬) বলেন,

قوله : نهى رسول الله ﷺ عن كلامنا - أيها الثلاثة -) هو دليل على وجوب هجران من ظهرت معصيته ، فلا يسلم عليه إلا أن يقلع وتظهر توبته . اهـ

"কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম লোকজনকে আমাদের তিন জনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেন' এটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত হবে, তাকে বর্জন করা ফরয। কাজেই তাকে সালাম দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে তা থেকে বিরত হয় এবং তার মাঝে তাওবা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।" [আলমুফহিম: ২২/১৩৫]

তাদের ঘটনা বিস্তারিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে দেখা যেতে পারে।

তদ্রূপ বেদআতীদেরকেও বর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের বিদআত পরিত্যাগ করে এবং লোকজন তাদের গোমরাহি থেকে সতর্ক ও নিরাপদ থাকতে পারে।

বি.দ্র.

এই প্রকারের বর্জন ও বয়কট ঐ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মুসলিমকে তিন দিনের অধিক বর্জন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন- হযরত আবু আইয়ূব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

[لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

"কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় তিন দিনের অধিক তার (দ্বীনি মুসলিম) ভাইকে পরিত্যাগ করে চলবে যে, দু'জন দেখা হয়ে গেলে সেও মুখ ফিরিয়ে নেবে, সেও

মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো- যে আগে সালাম দেবে।" [সহীহ বুখারী ৬২৩৭, সহীহ মুসলিম ৬৬৯৭]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৬৯৩

সংশয় নিরসনঃ শরয়ী দন্ডবীধি বাস্তবায়নের দায়িত্ব কি শুধু শাসকের?

Ahlos sogor

Senior Member

০৮-১৯-২০১৮

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض؛ على القادر عليه. ... وقول من قال؛ "لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه"، إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء؛ "الأمر الى الحاكم"، إنما هو العادل القادر، فاذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه. ... وكذلك الأمير؛ إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها، لم يجب تفويضها اليه مع إمكان إقامتها بدونه ... .والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان؛ أقيمت ... .اذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فانها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فان كان فى ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها؛ لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم(

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, যদি মেনে নেয়া হয় যে, আমীর উমারাগণ শরয়ী দন্ডবিধি (হদ্দ) প্রতিষ্ঠা করতে, মুসলিমদের হকসমূহ আদায় করতে অক্ষম হয় অথবা তারা নিজেরাই তা নষ্ট করে, তাহলে তা আদায় করতে যে সক্ষম হবে তার উপর আদায় করা ফরজ।

আর যে বলে, হদ্দ কেবল শাসক বা তার প্রতিনির্ধিই প্রতিষ্ঠা করবে (অন্যরা না), এটা তখন যখন তারা তা আদায় করতে সক্ষম বা ইনসাফের সাথে তা আদায় করে (নিজ দায়িত্বে)।

যেমনটি ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন. আমর বা নির্দেশ দেয়ার অধিকার শাসকের। নিশ্চয়ই সে হবে ন্যায়পরায়ন ও (হদ্দ আদায়ে) সক্ষম।

আর যদি সে নিজেই ইয়াতিমদের মাল নষ্ট করে অথবা আদায়ে অক্ষম হয়, তাহলে এই দায়িত্ব তার উপর অর্পন করা ওয়াজিব না অন্যরা তা হেফাজত করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও।

এমনিভাবে আমীর যদি শরয়ী দন্ডবিধি নষ্ট করে বা তা প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয়, তাহলেও অন্যরা তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও আমীরের উপর ন্যাস্ত করা ওয়াজিব না।

মূলকথা হলো, এই ওয়াজিবগুলো সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যখন আমীরের দ্বারা তা হবে তখন অন্যের তা করার প্রয়োজন নেই। আর যখন আমীর তা প্রতিষ্ঠা না করবে বা প্রতিষ্ঠা না করা হবে, বরং অন্যরা প্রতিষ্ঠা করবে বা অন্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হবে, তখনও তা (সেভাবেই) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(অন্যরা) এগুলো তখন করবে যখন তা করলে ফাসাদ সৃষ্টি হবেনা, না করার চেয়ে বড় ফিতনা আশঙ্কা হবেনা। কেননা তা হলো আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের একটি প্রকার। যদি তা করা আমীর ও প্রজাদের জন্য ফাসাদ বৃদ্ধিকারী হয় তাহলে হদ্দ প্রতিষ্ঠা না করার ফাসাদের উপর আরো ফাসাদ বৃদ্ধি করা যাবেনা। কেননা, ফাসাদ বৃদ্ধিকারী বিষয় দ্বারা ফাসাদ দমন করা যায়না। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। (মাজমূউল ফাতাওয়া)

Originally Posted by **ওমর বিন আ: আজিজ**

আমি এ ব্যাপারে শুধু ইবনে তাইমিয়া রহ.এর বক্তব্যই পেয়েছি আর অন্য কোন আলেম বা সালাফ বা কোন ফিকহ এর কিতাবে এমন ফতোয়া নেই। (ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়ার রেফারেন্সগুলোর সত্যতা যাচাই করার অনুরোধ) তাই অভিজ্ঞ ভাইদের নির্দেশনা কামনা করছি।

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-০১-২০১৮

মুহতারাম ভাই, এটা শুধু ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অভিমত না, আরো অনেকেরই অভিমত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ অভিমতটিই সঠিক। এ ব্যাপারে শায়খ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি রহ. বেশ লম্বা আলোচনা করেছেন। শায়খের কিতাব **منة الخبير في حكم إقامة الحدود في دار الحرب والتعزير**- এর শেষ দিকে আলোচনাটা আছে। ভাইয়ের দেখার সুবিধার্থে আমি শায়খের বক্তব্যটা তুলে দিচ্ছি-

من له إقامة عقوبة التعزير؟

من المعلوم بداهة أن أمر إقامة الحدود يرجع في أصله إلى الإمام أو من يقوم مقامه ممن يوكل إليه هذا ، وذلك لأن الإمام نائب عن الأمة ، وقائم مقامها ، ولكن كما نعلم فإن تقرير الأحكام الفقهية إذا كان بمعزل عن الو اقع ، ودون اعتبار لملابساته وملاحظة لتغير اته فإنه غالباً ما يكون مجرد ترف فكري يقوم به الفقيه أو الباحث ، لا تكاد تجنى به فائدة عملية مما يحتاجها الناس في حياتهم اليومية المتجددة ، وإن الفائدة العملية هي أساس الفقه ومقصوده ، فالمتكلم عما كتبه الفقهاء وأصلوه في كتبهم ودونوه في مصنفاتهم لا بد له وهو يغترف من ذلك المعين وينهل من ذلك المورد أن يقارن بين البيئة والظروف التي كانت تحيط بهم عند تسطيرهم لتلك الأحكام وبين الو اقع الذي يرغب في معرفة حكمه و إنزال ما قرره الفقهاء عليه ، حتى لا يبعد النجعة ، ويقوّل العلماء ما لم يقولوا ، وينسب إليهم ما لم يتبنوا ، وهذه المسألة في غاية الأهمية عند بحث أية جزئية لها ارتباطها الوثيق بالو اقع ومتغير اته ، فرب ظرف من الظروف أو حالة من الحالات أو ملابسة من الملابسات كان لها تأثيرها القوي والبارز في تقرير حكم شرعي معين ، فبمجرد تغير ذلك الظرف أو زوال تلك الحالة أو انتفاء تلك الملابسة يصبح الحكم مغايراً تماماً لما كان عليه تبعاً لتغير ذلك الو اقع ، فليس

الفقيه فقط من يستطيع أن يستخرج أقوال العلماء من دواوينهم ثم يرجح بينها ، و إنما لا بد أن يضيف إلى عمله قدرته على إنزال تلك الأحكام بصورة محكمة ومتقنة وصحيحة على الو اقع الذي يعيشه كما استطاع الفقهاء أن يحكموا به على و اقعهم الذي عاشوا فيه ، ولا نعني بذلك تقرير تطوير الشريعة الذي يدعو إليه بعض المنسلخين ، أو تمييعها من أجل ما يسميه بعض المنهزمين (مواكبة العصر) ، ولا الخروج عن القواعد والضو ابط الأصولية الثابتة المستقرة التي يتم بها الاستنباط والترجيح ، ولكن المقصود هو البحث في الو اقع والظروف والحالات التي كتب الفقهاء فيها الأحكام الشرعية المتعلقة بها ، وتمييز ما له تأثير منها في ترجيحاتهم مما ليس كذلك ، ثم البحث في مدى مطابقة أو مشابهة و اقع الباحث وظروفه وملابساته للظروف التي اعتبرها الفقهاء وكان لها تأثير في ترجيحات أقوالهم ، وإلا فإن إغفال مثل هذا الأمر وعدم (تحقيق المناط) تحقيقاً جيداً صحيحاً يوقع في اضطراب كبير في الأحكام ، ويجعل ما يكتبه الباحث ويقرره في واد وما كتبه الفقهاء وقرروه في واد آخر وإن ظن أن حاله كحالهم وأن ما يكتبه هو عين ما في كتبهم .ومسألتنا التي نحن بصددها من هذا القبيل أو الجنس ، وذلك لأن أحوال المسلمين في حياتهم المرتبطة بإقامة الحدود والتعازير لا تخرج عن صورتين : الأولى : أن يكونوا تحت إمام ممكن له ، مطاع فيهم ، يقوم بمهامه الشرعية من تجييش الجيوش ، و إقامة الجهاد وتنفيذ الحدود والأحكام وغير ذلك مما هو من واجبات الأئمة التي ألزمهم الشارع بها . الثانية : أن يكون المسلمون بلا إمام يقيم فيهم أحكام الله وينفذ أوامره ، وهذه هي حال حياة المسلمين اليوم ، فالمسلمون يعيشون تحت أحكام الكفر وقو انين الجاهلية والياسقات العصرية ، تجري عليهم أحكام الكافرين ، وهم ملزمون بالتحاكم إلى تلك القو انين ، فصارت شر ائع الإسلام نسياً منسياً ، فهم يعيشون بلا راع يحوطهم ، ولا إمام يقيم فيهم الملة ، وبهذه الحالة أصبحت الصورة الأولى التي ذكرناها في عداد المتمنيات ، وما قامت الجماعات الإسلامية

إلا وهي تسعى للوصول إلى تلك الحالة وبلوغها ، وإذا تأملنا في كلام الفقهاء حول إقامة الحدود ومن يقيمها ، والظروف التي دونوا فيها تلك الأحكام لوجدناها منطبقة على الصورة الأولى ، حيث وجود إمام ممكن ذي سلطان وقدرة ، يقيم أحكام الله ويلزم الناس بها ، لأن قولهم مثلاً : إن التعازير لا يقوم بها إلا الإمام؟ يقتضي أن هناك إماماً موجوداً قائماً قادراً على إقامة هذه الأحكام ، وحيث لا إمام – حسب هذه العبارة – فإن إقامتها تؤخر إلى مجيئه ، أو تبطل كلياً لانعدامه ، فهل هذا الفهم لكلام الفقهاء يكون وجيهاً ؟ ، بحيث يعيش الناس عند خلو الزمان أو المكان من إمام ممكن في فوضى ، ويحرم عليهم أن يقيموا فيما بينهم ما يستطيعون من أحكام الإسلام (التي كانت في أصلها من مهام الإمام) وينفذوا ما في وسعهم من زواجره وعقوباته ، بينما يختص التنعم بتلك الأحكام الشرعية والتظلل بظلها بمن كان تحت إمام شرعي ممكن ؟ .أنقل أولاً أقوال الفقهاء في هذه المسألة ثم أحاول أن أبين ما يترجح لي في ذلك ومن الله أستمد العون : قال الإمام الصنعاني -رحمه الله- : [وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة : الأب فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم ، والزجر عن سيئ الأخلاق ، والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك ، وللأمر بالصلاة والضرب عليها ، وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً ، والثاني : السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح ، والثالث : الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن [(1)]، وقد زاد كثير من العلماء على هؤلاء الثلاثة تأديب المعلم من يتأدب عنده ، وقال في نهاية المحتاج عند قول صاحب المتن : [" ويجتهد الإمام في جنسه وقدره " قال الشارح : و أفهم كلامه عدم استيفاء غير الإمام له ثم قال محشيه ":قوله عدم استيفاء غير الإمام له " أي فلو فعله لم يقع الموقع ، ويعزر على تعديه على المجني عليه [(2)]، ولا شك أن المقصود من العقوبات المحددة أو غيرها هو زجر الناس عن ارتكاب المحرمات ، وإلزامهم بفعل الواجبات ، والمحافظة على دين الناس و أنفسهم وأعراضهم

وعقولهم وأموالهم ، وهذا المقصد الشرعي الهام لا يراعى في حالة دون حالة ، ولا في زمن دون زمن أو مكان دون مكان ، بل الشريعة جاءت بكل ما يحفظ دين الناس ، ويبقي الشرع بعيداً عن البدع والمحدثات والزيادة والنقص فيه ، وجاء فيها من الزواجر والترهيب عن ظلم الناس والتعدي عليهم في أنفسهم ، أو الطعن في أعراضهم ، وأكل أموالهم بغير حق الكثير الكثير ، فبما أن هذه المقاصد الشرعية هي من أهم الأمور المرعية في الشرع ، وعلم أنها لا تختص بحالة أو زمن أو مكان ، وإنما هي ملازمة لهذا الدين ، وأن فساد العالم وخرابه مبني على فساد إحدى هذه الأمور، وصلاحه يكون بحسب صلاحها ، علمنا أن الشارع إنما أوكل أمر إقامة الحدود للإمام لما فيه من كف الناس عن الظلم ، وقدرته بما لديه من سلطان من الانتصاف للمظلوم ورد الحقوق إلى أهلها على وجه تنعدم أو تقل فيه الفوضى إلى أقصى حد ، وتستقيم أمور الناس على الحق ، وينتظم معاشهم فيعيشون آمنين مطمئنين ، إذ لا يخفى أن إسناد أمر إقامة الحدود إلى آحاد الناس ، وإطلاق أيديهم لاستيفائها من بعضهم يجر إلى تهارج لا ينقطع ، وفساد لا ينتهي أو يندفع ، مما يلغي الفائدة التي جاءت لأجلها الحدود ، ويأتي بنتيجة مضادة تماماً للمقصود ، وهذا أمر مدرك بالشرع والعقل ، ومع ذلك فمحال أن يترك الناس سدى من غير رادع ولا وازع عند شغور الزمان من سلطان ، وخلوه من صاحب الشوكة الممكن الذي أوكل إليه أمر إقامة الزواجر، كما أنه من المستحيل أن تجوز الشريعة للناس في مثل هذا الظرف أو غيره أن يتواطئوا على أحكام ليست من الشرع في شيء ليعتمدوا عليها في فض نزاعاتهم ، ورفع خصوماتهم ، واسترداد حقوقهم . ولأهمية إقامة الحدود والتعازير بين الناس ، ولإيجاب الشارع ذلك عليهم ، فإن بعض العلماء استدل على وجوب تنصيب الإمام بالأدلة الآمرة بوجوب إقامة الحدود ، للعلم بأن انعدام الإمام يجعل حياة الناس فوضى كالأغنام التي لا راعي لها ، وإذا لم تقم في الناس حدود الله تعالى ويحكم فيهم بكتابه فلا تسأل بعدها عن مدى الخراب والفساد الذي

يصيب دينهم ودنياهم كما نراه اليوم ، وفي هذا يقول العلامة ابن عادل الحنبلي في تفسير قوله تعالى[: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)]المائدة] :(38 :احتجوا بهذه الآية على أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماماً معيناً ، لأنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة ، فلابد من شخص يكون مخاطباً بهذا الخطاب ، وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا الإمام ، فلما كان هذا تكليفاً جازماً ، ولا يمكن الخروج من عهدته إلا بوجود إمام وجب نصبه ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب [(1)]. ولا شك أن تنصيب الإمام واجب على الأمة كما حكى الإجماع على ذلك غيرواحد من العلماء ، إلا أن هذا لا يعني أن الأمة في سعة من أمرها في ترك القيام بباقي الواجبات حسب الاستطاعة وبما في الوسع سواء منها ما كان موكولاً إلى الإمام أم لا ، لأن عموم الواجبات الشرعية ليست مختصة بزمن دون زمن ولا متقيدة بمكان دون آخر و إنما الواجب القيام بها وأدائها حسب المستطاع ، وأمر إقامة الحدود من هذا القبيل .وهنا نشير إلى مسألة مهمة ، وهي أن العلماء رغم تنصيصهم على أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام ، ولا يستوفيها غيره أو من ينوب عنه كما قالوا: [ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه [(1)]]، مع ذلك فقد ذكروا مسألة (التحكيم) وحقيقتها : أنه لو تحاكم اثنان لمن هو أهل للقضاء – والإمام موجود- لنفذ حكمه ومضى ما قضى به ، تماماً كما يمضي حكم من ولاه الإمام ذلك من القضاة على خلاف بينهم في حدود ومجال ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز، قال الشيخ ابن ضويان -رحمه الله- : ["فلو حكم اثنان أو أكثر بينهما شخصاً صالحاً للقضاء : نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه" لحديث أبي شريح وفيه : أنه قال : " يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين ، قال ما أحسن هذا" رواه النسائي ، " وتحاكم عمر و أُبيّ إلى زيد بن ثابت ، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير

بن مطعم ، ولم يكن أحد منهما قاضياً [2]["، ولا تكاد المذاهب تختلف في أصل جواز التحكيم و إنما وقع بينهم الاختلاف في حدود هذا التحكيم وما يجوز منه وما لا يجوز ، فأطلق بعضهم وحصره بعضهم في قضايا وأمور معينة . قال البهوتي : [وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء بينهما فحكم ، نفذ حكمه في المال والقصاص والحد النكاح واللعان وغيرها ، حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام ، لما روى أبو شريح أن رسول الله rقال له : "إن الله هو الحكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ قال : إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان ، قال : فما أحسن هذا ، فمن أكبر ولدك ؟ قال شريح ، قال : فأنت أبو شريح " أخرجه النسائي ، وعنه " : rمن حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله " رواه أبو بكر ، ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم ، ولأن عمر و أبياً تحاكما إلى زيد بن ثابت ، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضياً . [1][فإذا كان هذا والإمام قائم والقضاة موجودون منصَّبون ، فكيف لا يجوز للناس عند شغور الزمان من القضاة ، وخلوه ممن يكون له سلطان وقدرة يقيم بها ما يستطاع من أحكام الشرع وحدوده ، أن يقدموا من يرتضونه من أهل العلم والدين والشوكة فيجري عليهم ما في الوسع من تلك الأحكام ؟! ، لا سيما وأن الحدود التعازير قد خوطب بإقامتها مجموع الأمة ابتداء ، و إنما الإمام نائب عنهم ، وقائم مقامهم ، لما أوتي من سلطان وقوة وقدرة يستطيع بها استيفاء الحقوق ، ورد المظالم ، وقطع التهارش ، وكف الأيدي عن الظلم والعدوان ، فإذا انعدم هذا الإمام في زمان من الأزمنة ، أو انحسر سلطانه في مكان من الأمكنة لعجز أو تفريط ، رجع الخطاب إلى مجموع الأمة ، وصارت مطالبة بإقامة أحكام الله وحدوده حسب المستطاع وبقدر الإمكان لقول الله تعالى[: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)]البقرة : 286) ، والتحاكم بين الناس إلى مقدم يرتضونه يفصل بينهم بالشرع غالباً ما يكون في الطوق ، وقال الله تعالى[: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا]

)التغابن : 16) ، ولقول النبي] : rما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. [2][وقد أوضح شيخ الإسلام -رحمه الله- هذه القضية أيضاًحا تاماً وبينها بياناً كافياً شافياً لا مزيد عليه فقال : [خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاً كقوله [: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ]، وقوله [: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا]، وقوله [: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ]، وكذلك قوله [: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً]، لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادراً عليه ، والعاجزون لا يجب عليهم ، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد ، بل هو نوع من الجهاد ، فقوله [: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ]، وقوله [: وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ]، وقوله [: إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ]، ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين ، والقدرة هي السلطان ، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه ، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه ، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ، ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل ، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزاباً أوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم ، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم ، وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة ، فإن ذلك أيضاً إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك ، بل عليهم أن يقيموا ذلك ، وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك ، لكان ذلك الفرض على القادر عليه ، وقول من قال : لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل ، كما يقول الفقهاء : الأمر إلى الحكام ، إنما هو العادل القادر، فإذا كان مضيعاً لأموال اليتامى أو عاجزاً عنها لم يجب تسليمها إليه مع

إمكان حفظها بدونه ، وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه ، والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه ، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت ، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها ، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه والله أعلم [1]] ، كما تكلم إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة فقال : [فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنعة ، فكيف تجري قضايا الولايات ، وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات فنقول : أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ، ومراجعة مرموق العصر ، كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد ، واستيفاء القصاص في النفس والطرف ، فيتولاه الناس عند خلو الدهر . ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد ، فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... وإذا لم يصادف الناس قواماً بأمورهم يلوذون به ، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد ، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد ... وقد قال بعض العلماء : لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة ، وسكان كل قرية ، أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى ، وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره ، وينتهون عن مناهيه ومزاجره ، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات ، وتبلدوا عند إظلال الواقعات . [1]] وقال ابن نجيم : [وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه ، كما هو في بعض بلاد المسلمين ، غلب عليهم الكفار في بلاد المغرب كقرطبة الآن وبلنسية وبلاد الحبشة ، و أقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم ، يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه والياً ، فيولي قاضياً ويكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا إماماً

يصلي بهم الجمعة [2][وإن كان كلامه يحتمل أن يكون ما يتولاه القاضي في مثل هذه الحال شاملاً للحدود وغيرها ، ويحتمل أن تقصر ولايته عنها وتنحصر فيما دونها والأول أظهر.

وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله- : [قوله : (إن وقع سببها في زمن ومكان يليه) ، أقول : هذا مبني على أن الحدود إلى الأئمة ، وأنه لا يقيمها غيرهم على من وجبت عليه ، وليس على هذا أثارة من علم ، وما استدلوا به من المروي بلفظ " أربعة إلى الأئمة " فلا أصل له ، ولا يثبت بوجه من الوجوه ، بل هو مروي من قول بعض السلف ، ولا شك أن الإمام ومن يلي من جهته هم أولى من غيرهم كما قدمنا ، وأما أنه (لا) يقيمها إلا الأئمة وأنها ساقطة إذا وقعت في غير زمن إمام ، أو في غير مكان يليه فباطل ، وإسقاط لما أوجبه الله من الحدود في كتابه ، والإسلام موجود ، والكتاب والسنة موجودان ، وأهل الصلاح والعلم موجودون ، فكيف تهمل حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين ؟ !ومع هذا فلا يعدم من له ولاية من إمام ، أو سلطان ، أو متول من جهة أحدهما ، أو منتصب بالصلاحية في كل قطر من أقطار المسلمين ، وإن خلا عن ذلك بعض البادية لم تخل الحاضرة.[3]]

---

[1])-سبل السلام : 38/4)-[2].(نهاية المحتاج : 22/8)-[1].(اللباب في علوم الكتاب : 332/7)-[1].(الشرح الكبير : 118/10)-[2].(منار السبيل : 408/2)-[1].(كشاف القناع : 308/6 -[2].(رواه البخاري ، ومسلم ، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه)-[1].مجموع الفتاوى : 175/34)-[1].(الغياثي : 386- 388)-[2].(البحر الرائق : 298/6)-[3].(السيل الجرار : 311/4.(خلاصة القول في هذه المسألةأن الآيات والأحاديث التي جاءت آمرة بإقامة الحدود تدل صيغها على الوجوب ، كما أن

صورة الخطاب فيها لمجموع المسلمين فمن ذلك قوله سبحانه [: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ])المائدة : 38) ، وكقوله[: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ)]النور: 2)، وكقوله[: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)]النور: 4-5) ، وكقوله] : rمن بدل دينه فاقتلوه [1][، ومثل ذلك كثير ، ونظيره ما جاء في شأن التعزير كقوله] : rأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود] ، وكقوله] : rلا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله] ، ومن المعلوم أن إقامة الحدود بين الناس تعد من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد امتدح الله سبحانه هذه الأمة لقيامها بهذه الفريضة العظيمة فقال[: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)]آل عمران : 110)، وأمر هذه الأمة أن ينتدب منها طائفة تقوم بهذا الواجب الذي تحفظ به نفسها من الانحراف والتفكك وشيوع الفساد والظلم والبغي واستفحال أمر الإحداث في الدين و انتشار البدع بين أهله فقال سبحانه [وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)]آل عمران : 104 .(إذا علم أن إقامة الحدود يعد أمراً واجباً ، وأن الأمة بمجموعها هي المعنية في أصل الخطاب بإقامة هذا الواجب ، فعليه أن الواجب تنفيذ هذا الأمر الإلهي بقدر الإمكان وبما في الوسع وأن تبذل كافة الوسائل التي تؤدي إلى إقامته ، ولا يسقط المطالبة بإقامة هذا الواجب إلا العجز وعدم الاستطاعة ، أو كون الصورة التي يمكن بها تنفيذه تؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة ترك إقامة ذلك الواجب ، وهذا أمر مطرد في كل الأوامر الشرعية ، وليس خاصاً بإقامة الحدود والتعازير فحسب قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : ["قاعدة" : وهي أن من كلف

بشيء من الطاعات ، فقدر على بعضه وعجز عن بعضه ، فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لقوله – سبحانه وتعالى[: - لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا]وقوله عليه السلام : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [1]"[، وهي نظير القاعدة الفقهية المعروفة بأن الميسور لا يسقط بالمعسور والله تعالى أعلم .

إذاً فالإمام يعتبر نائباً عن الأمة في إقامة الحدود ، وذلك بما لديه من سلطان يستطيع به إلزام الناس بالأحكام ، ويجري عليهم الشرائع طوعاً أو كرهاً ، فما دام الحاكم أو الإمام صاحب السلطان موجوداً وقادراً على تنفيذ الأحكام والقيام بما أوكل إليه من مهام ناب فيها عن الأمة فإن الخطاب بإقامة الحدود والتعازير متوجه إليه ، وهو مسؤول عنه ، وعلى الأمة مراقبته ومتابعته وإعانته في ذلك ، فإن عجز الإمام عن القيام ببعض الواجبات أو قصر في بعضها وفرط وثمة من يستطيع إقامة ما عجز أو فرط فيه الإمام تعين عليه إقامته ، وتوجه الخطاب إليه ما لم يجر إلى مفسدة هي أعظم من ترك ذلك الواجب ، قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- تعالى : [وأما كونه يجب إقامة الحدود على الإمام ووالية ، فوجهه واضح ظاهر ، لأن الله سبحانه قد أمر عباده بإقامة الحدود وقال : [الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ]، وقال[: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا]، وقال[: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ]الآية ، والتكليف في هذا وإن كان متوجهاً إلى جميع المسلمين ولكن الأئمة ومن يلي من جهتهم ومن له قدرة على تنفيذ حدود الله مع عدم وجود الإمام يدخلون في هذا التكليف دخولاً أولياً ، ويتوجه إليهم الخطاب توجهاً كاملاً . [2]"[ومن المعلوم المشاهد أن كثيراً من المسلمين بل أكثرهم يعيشون تحت سلطان الكفرة وقهرهم فتجري عليهم أحكام الكافرين ، ويلزمون بالحكم والتحاكم إلى قوانينهم الجاهلية وأحكامهم الوضعية ، وهذا من أعظم المنكر والفساد الذي يجب على الأمة أن تزيله قدر استطاعتها ، وهو أشد ما ابتليت به

الأمة في هذا العصر ، وتحكيم القوانين الوضعية والنظم الكفرية فوق أنه أمر كفري عظيم ومنازعة لله رب العالمين ، فإن المفاسد التي يجرها على الناس في دينهم ودنياهم وأخلاقهم وآدابهم لا تكاد تحصى ويشمل ذلك كله صفة الضنك التي ذكرها الله بقوله[: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)]طه : 124) ، فمهما قيل من المفاسد التي قد تنجم عن تحاكم الناس فيما بينهم لشرع الله بحسب ما يستطيعون – عند فقدهم للإمام – فإنها تعد دون المفسدة الكبرى المتمثلة في ترك شريعة الرحمن ، و إقامة وتحكيم شريعة الشيطان كما قال سبحانه[: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً])النساء : 65) وكما قال سبحانه[: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)]النساء : 59 . (ومن ذلك إقامة الحدود والتعازير، فإنها من جملة أحكام الله تعالى التي يجب إقامتها ، بل هي أبرز ما يكون من تلك الأحكام ، فالواجب على المسلمين عند فقدان الإمام الذي يقيمها ، والذي أوكل إليه في الأصل أمر تنفيذها واستيفائها أن يتعاونوا فيما بينهم ويتضامنوا في إيجاد الكيفية التي يقيمونها بها ، حتى يخرجوا من حرج الحكم والتحاكم إلى القوانين الجاهلية ، ومن هنا فالذي يظهر أن المسلمين في كل مصر من الأمصار سواء منها ما كان تحت سلطان المرتدين أو الكفار الأصليين يجب عليهم أن يتواضعوا على طريقة وكيفية يستطيعون من خلالها إقامة ما يمكنهم من أحكام الله تعالى فيما بينهم ، سواء منها الحدود أو التعازير أو فض المنازعات ، فهم مسؤولون أمام الله تعالى في ذلك ، فكما أنهم مطالبون شرعاً بالسعي الجاد لتنصيب الإمام الذي يقيم أحكام الملة فيهم ، فإنهم أيضاً مخاطبون بإقامة ما في وسعهم من تلك الأحكام وهم أثناء سعيهم لتنصيب الإمام ، فلا يقال إن المسلمين في حل من الالتزام والتعاون فيما بينهم على تنفيذ أحكام

الله من الحدود والتعازير وغيرها بمجرد غياب الإمام ، فهذا من أبعد الأقوال عن الحق ، وأكثرها داعية لفشو الفساد وتمكنه ، واستمراء المنكرات العظيمة و اتنشارها ، وعلى رأسها التحاكم إلى القو انين الوضعية كما هو مشاهد اليوم في أمصار المسلمين . فالو اقع المشاهد يقرر بوضوح أن المسلمين بين أمرين لا ثالث لهما ، إما أن يخنعوا لأحكام الكافرين التي علتهم ، ويتحاكموا إليها في منازعاتهم ، ويفضوا بها خلافاتهم ، ويعتبروها قانوناً سارياً عليهم وملزماً لهم ، وإما أن يسعوا بقدر طاقتهم وبما في وسعهم إلى إيجاد كيفية ينفكون بها عن تلك القو انين ويتنصلون من التحاكم إليها ويتجمعون لإقامة ما في الطوق من أحكام الله سواء منها الحدود والتعازير أوغيرها من الأحكام ، ولا شك أن خضوعهم لنظم الكافرين ، وبقاءهم تحت حكمهم ، والسعي لفض المنازعات في محاكمهم – ولو كانوا لذلك كارهين – لا يجوز شرعاً مع إمكانية الخروج من هذه الحال ولو بصورة جزئية محدودة ، أما عند العجز الحقيقي فالحكم آنذاك له حالته الخاصة و مجاله المحدود ، فالجماعات الإسلامية العاملة في الساحة الإسلامية على اختلاف توجهاتها أول معني بهذا الأمر ونشره بين الناس و إقامته – حسب الاستطاعة ومع المراعاة التامة للمفاسد والمصالح – بين أفرادها المنضوين تحتها ، كما بُيّن عند الترجيح لحكم إقامة الحدود في دار الحرب ، إذ ليس ثمة تعارض بين ما يقال هنا وبين ما ترجح هناك ، ولا شك أن الأنظمة والحكومات القائمة على رؤوس الناس والمتسلطة على الشعوب المسلمة تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل الحيلولة بين المسلمين وبين إحياء هذه الشر ائع ، ولهذا فهي تحارب من دعا إلى تطبيقها حرباً لا هوادة فيها سالكة في ذلك جميع الوسائل من سجن وتقتيل وتشريد وتهجير ، حرصاً منها على إبقاء تلك الشعوب تحت ربقة قو انينها الجاهلية ، فلهذا فإن مراعاة ما يترتب على تنفيذ الحدود و إقامتها من المفاسد وما ستجره من ذلك على منفيذيها والقائمين عليها وعلى الشعوب ككل أمر واجب ومتحتم ، وهي في هذه الحالة داخلة بلا شك في مسألة

المقارنة بين المصالح والمفاسد ، فرب عقوبة تقام على شخص واحد أتى بموجبها تجر من المفاسد أضعاف أضعاف مفسدة ترك إقامة تلك العقوبة عليه ، كما فصل ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى في النقل المذكور سابقاً ، ولهذا فالمعتبر النظر في كل حالة بعينها ، إذ بهذه الكيفية أو الطريقة يتم تقدير المصالح والمفاسد المتعلقة بها ، وما يمكن إقامته من العقوبات مع مراعاة ما ذكر والتقيد به لا يترك لأجل العجز عن غيرها ، فإن الحدود والتعازير تعد من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمرنا شرعاً أن نأتي منه ما استطعنا وأن ننكر ما نقدر على إنكاره ، قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : [وما جاءت به الشريعة من المأمورات ، والعقوبات ، والكفارات وغير ذلك ، فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة ، فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده ، وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته ، فإذا لم يمكن النفي والحبس عن جميع الناس كان النفي والحبس على حسب القدرة ، مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها ، لا يخرج منها ، أو أن لا يباشر إلا شخصاً أو شخصين فهذا هو الممكن ، فيكون هو المأمور به ، وإن أمكن أن يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور به ، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فالقليل من الخير خير من تركه ، ودفع بعض الشر خير من تركه كله [1][والله تعالى أعلم .

---

[1] -رواه البخاري عن ابن عباس ﷺ ، وقد سبق)-[1].قواعد الأحكام : 7/2-[2].( )السيل الجرار: 310/4)-[1].(مجموع الفتاوى : 312/15 .(

আসলে ফিকহের প্রায় সব কিতাবে এ কথাই পাওয়া যাবে যে, হদ ইমামুল মুসলিমীন কায়েমের করবেন। ফুকাহায়ে কেরাম এ কথা বলেছেন এ হিসেবে যে, মুসলমানদের একজন ইমাম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। প্রশাসনিক বিষয়াশয় তিনিই

দেখা শুনা-করবেন। এ জন্যই তো ইমাম নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইমাম না থাকলে হদ কায়েম করা যাবে না। কেননা, যে ভূখণ্ডে ইমামুল মুসলিমীনের কতৃত্ব নেই, বরং স্থানীয় আমীরের নেতৃত্ব চলে এবং তার হদ কায়েম করার মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য আছেসেখানেও হদ কায়েম করতে হবে। যে -মন ধরুন - তালেবানদের শাসনামলে খেলাফত ছিল না, খলিফাও ছিল না। তবে একটা ভূখণ্ডে তালেবানদের শাসনক্ষমতা ছিল। তখন তারা হদ কায়েম করতেন এবং এটা তাদের উপর ফরয ছিল। ইমাম না থাকলেও এখানে হদ কায়েম করতে হচ্ছে। কারণ, হদ কায়েমের সামর্থ্য পাওয়া যাচ্ছে। সব ক্ষেত্রে কথা এটাই যে, ফেতনা ব্যতীত হদ কায়েমের পর্যাপ্ত সামর্থ্য থাকলে হদ কায়েম করতে হবেচাই খলিফা - থাকুক বা না থাকুক। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহএর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেও বিষয়া . কিছুটা আন্দাজ হবে ইনশাআল্লাহ।

ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان بل لهم أمير منهم مستقل بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الأمير في حكم السلطان فيصح منه تولية القاضي عليهم:: رد المحتار: 5\369

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৪৪৮

জিহাদ ও অন্যান্য ফরযের সমন্বয় সাধনই মধ্যম পন্থা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১৪-২০১৮

এক ভাই জিহাদ সম্পর্কে একটি সুন্দর পোস্ট দিয়েছেন। তাতে মুহতারাম ভাই অনেক সুন্দর কথা বলেছেন। তবে [কোন ইবাদতই জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে না] কথাটা অস্পষ্ট হওয়ায় তা থেকে ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে। তাই একটু তাম্বীহ করা প্রয়োজন মনে করছি।

তাছাড়া প্রাথমিকভাবে ভাইয়েরা যখন জিহাদে যোগ দেন, তখন সমাজের উলামায়ে কেরামের গাফলত, অপব্যাখ্যা, জিহাদ সম্পর্কে লোকজনের উদাসীনতা-ইত্যাদির কারণে অন্তরে প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে জিহাদে যোগ দেন। তাছাড়া জিহাদের ফাযায়েলগুলো প্রথমবার দেখার কারণে মনে হয়- দুনিয়াতে জিহাদের চেয়ে বা তার সমকক্ষ আর কোন ইবাদত নেই। আল্লাহ মাফ করুন- কারো কারো মধ্যে এমনটাও হয়ে থাকে যে, জিহাদের কাজের দরুণ অন্যান্য ফরয আদায়ে ত্রুটি করেন। পিতা-মাতার নাফরমানী, উস্তাদের অবাধ্যতা- ইত্যাদি প্রায়ই হয়ে থাকে। মনে করেন, জিহাদ ফরয হয়ে গেছে। এখন আর কোন কিছুই দেখার নেই। এ কারণে জিহাদ ও অন্যান্য ফরয নিয়ে কিছু কথা বলা সময়ের দাবি মনে হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, জিহাদ শরীয়তের একটি ফরয। শরীয়তে আরো অনেক ফরয রয়েছে। কোনোটা ফরযে আইন, কোনোটা ফরযে কেফায়া। আল্লাহ তাআলা কতৃক আরোপকৃত সবগুলো ফরযই আদায় করতে হবে। একটা করতে গিয়ে আরেকটা ছাড়া যাবে না। অন্যান্য ফরয আদায় করতে গিয়ে যেমন জিহাদ ছাড়া যাবে না, জিহাদ করতে গিয়েও অন্য কোন ফরয ছাড়া যাবে না। একান্তই যদি কোথাও খন্দক যুদ্ধের অবস্থা তৈয়ার হয়, তাহলে কথা ভিন্ন। তদ্রূপ, জিহাদের প্রয়োজনে যেসব বিষয়ের অনুমোদন আছে, সেগুলোর কথাও ভিন্ন।

শরীয়তে স্বাভাবিক অবস্থায় আরকানে খামসা তথা ঈমান ও ঈমানের পর নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সবচেয়ে বেশি। এগুলোর সমকক্ষ অন্য কোন ইবাদাত হতে পারে না। এমনকি জিহাদও না। কেননা, এগুলো ফরযে আইন

(নামায-রোযা সকলের উপরই ফরযে আইন, আর হজ্ব-যাকাত সামর্থ্য সাপেক্ষে)। আর জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় ফরযে কেফায়া। আর ফরযে আইনের গুরুত্ব ও ফজিলত ফরযে কেফায়ার চেয়ে বেশি।

ঈমানের পরই ফরয নামাযের গুরুত্ব। বহু হাদিসে ফরযে কেফায়া জিহাদের চেয়ে নামায শ্রেষ্ট বলে বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন,

قلت يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال) الصلاة على ميقاتها) . قلت ثم أي ؟ قال (ثم بر الوالدين) . قلت ثم أي ؟ قال (الجهاد في سبيل الله(

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি উত্তর দেন, সময়মতো নামায় আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন আমল? তিনি উত্তর দেন, এরপর হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে সদ্বব্যবহার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন আমল? তিনি উত্তর দেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (সহীহ বুখারী: ২৬৩০)

এ হাদিসে ঠিক ঠিক মতো গুরুত্বের সাথে ফরয নামায সময়মতো আদায় করা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্বব্যবহার ও ফরমাবরদারিকে জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। কেননা, এ উভয়টি ফরযে আইন, আর জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় ফরযে কেফায়া। আর ফরযে আইন ফরযে কেফায়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এমনকি এমতাবস্থায় যদি পিতা মাতা অনুমতি না দেন, তাহলে জিহাদেও যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ফরযে আইন হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। তখন পিতা-মাতা নিষেধ করলেও জিহাদে যেতে হবে। যেমনটা অন্য হাদিসে এসেছে।

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

لا يتردد في أن المواظبة على أداء فرائض الصلاة وأخذ النفس بها في أوقاتها على ما هو المراد من قوله الصلاة على ميقاتها أفضل من الجهاد. ولأن هذه فرض عين وتتكرر والجهاد ليس كذلك، ولأن افتراض الجهاد ليس إلا للإيمان و إقامة الصلاة. اهـ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ‘সময়মতো নামায আদায় করা’ দ্বারা উদ্দেশ্য- দায়েমীভাবে ফরয নামায ওয়াক্তমতো আদায় করা এবং নিজের নফসকে এ ব্যাপারে শাসনে রাখা। সন্দেহ নেই যে, এটি জিহাদের চেয়ে উত্তম। তাছাড়া এটি হচ্ছে ফরযে আইন এবং বারবার এসে থাকে। কিন্তু জিহাদ এমন নয়। তাছাড়া জিহাদ তো ফরয করাই হয়েছে ঈমান ও নামায কায়েমের জন্য।” (ফাতহুল কাদির: ৫/৪৩৫)

অন্য হাদিসে এসেছে যে, সকল ফরযে আইন স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদের চেয়ে উত্তম।

ইমাম দারেমী রহ. বর্ণনা করেন,

عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أن رسول الله (قام فخطب فحمد الله و أثنى عليه ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئا أفضل منه إلا الفرائض

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা তার পিতা আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, এক দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানার পর জিহাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। তখন তিনি ফারায়েজ ব্যতীত অন্য কিছুকেই জিহাদের চেয়ে উত্তম রাখেননি।” (সুনানে দারেমী: ২৪৬৭)

এ হাদিসে ফরযসমূহকে জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। ফরয দ্বারা এখানে ফরযে আইন উদ্দেশ্য। আর জিহাদ দ্বারা ফরযে কেফায়ার হালতে জিহাদ উদ্দেশ্য। এ হাদিস থেকে বুঝা যায়: ফরযে কেফায়া জিহাদের চেয়ে ফরযে আইন ইবাদত উত্তম।

এ হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

يريد به الفرائض التي يثبت فرضها عينا ، وهي الأركان الخمسة .والجهاد فرض أيضا لكنه فرض كفاية ، والثواب بحسب وكادة الفريضة ، فما يكون فرضا عينا فهو أقوى ، فلهذا استثنى الفرائض من جملة ما فضل رسول الله عليه السلام الجهاد عليه .اهـ

“এখানে ফরযসমূহ দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ফরযে আইনগুলো। সেগুলো হল- আরকানে খামসা (ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত)। জিহাদও ফরয, তবে ফরযে কেফায়া। আর সওয়াবের পরিমাণ ফরযের গুরুত্ব হিসেবে হয়ে থাকে। যেটি ফরযে আইন, সেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিষয়ের উপর জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, সেগুলো থেকে ফরযসমূহকে আলাদা রেখেছেন।” (শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/২৩)

তবে এমতাবস্থায় জিহাদ অন্য সকল নফল ইবাদত থেকে উত্তম। যেমনটা উপরোক্ত হাদিসসহ আরো অনেক হাদিস থেকে বুঝা যায়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

والأمر بالجهاد وذكر فضائله فى الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الانسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع -كما دل عليه الكتاب والسنة. اهـ

“কোরআন-সুন্নাহয় জিহাদের আদেশ ও তার ফাযায়েলের আলোচনা অগণিত। এ কারণে জিহাদ কোন ব্যক্তির নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। উলামায়ে কেরাম সকলে একমত যে- হজ্ব, উমরা, নফল নামায ও নফল রোযার চেয়ে জিহাদ শ্রেষ্ট; যেমনটা কোরআন সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৫২)

অন্যত্র বলেন,

اتفق العلماء فيما اعلم على انه ليس فى التطوعات افضل من الجهاد فهو افضل من الحج و افضل من الصوم التطوع و افضل من الصلاة التطوع. اهـ

“আমার জানা মতে, উলামায়ে কেরাম সকলে একমত যে, নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে জিহাদের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। জিহাদ হজ্বের চেয়ে উত্তম। নফল রোযা ও নফল নামাযের চেয়ে উত্তম।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৪১৮)

যে হাদিসে জিহাদকে দিনভর রোযা আর রাতভর নামাযের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য- নফল নামায ও নফল রোযা।

তবে এমতাবস্থায় জিহাদ উত্তম না'কি ইলম উত্তম সেটা মতভেদপূর্ণ। কেননা, ইলমও জিহাদের মতোই ফরযে কেফায়া।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন:

واعلم أن شغل العلم أفضل الأشغال عند أبي حنيفة، ومالك؛ وعند أحمد الجهاد أفضلها، كذا في «منهاج السنة» لابن تيمية، وفي كتاب السفاريني عن أحمد رواية نحو أبي حنيفة، ومالك. وهذا كله إذا لم يكن الجهاد فرض الوقت، لأن الكلام في باب الفضائل دون الفرائض.اهـ

"জেনে রাখ, আবু হানিফা রহ. এবং মালেক রহ. এর মতে ইলমে দ্বীন অর্জনে ব্যাপৃত থাকা সর্বোত্তম কাজ। ইমাম আহমদ রহ. এর মতে সর্বোত্তম হল জিহাদ। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর 'মিনহাজুস সুন্নাহ' তে এমনই বলা হয়েছে। 'সিফারিনী' রহ. এর কিতাবে আহমদ রহ. থেকে আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ. এর অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। তবে এ সব কিছু হচ্ছে, যখন জিহাদ ফরযে আইন না হয়ে থাকবে। কেননা, আলোচনা হচ্ছে ফজিলত নিয়ে, ফরয নিয়ে নয়।" (ফয়জুল বারি: ৩/৪১৯, কিতাবুল জিহাদ)

তবে যদি শত্রু মাথার উপর এসে যায়, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় এবং এই মূহুর্তে জিহাদে বের হওয়া ভিন্ন শত্রু প্রতিহত করার কোন উপায় না থাকে - তাহলে জিহাদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

যেমনটা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه.اهـ

"ঈমানের পর আগ্রাসী শত্রু যে দ্বীন ও দুনিয়ার বিনাশ করছে, তাকে প্রতিহত করার চেয়ে আবশ্যক কোন বিষয় নেই।" (আল-ফাতাওয়াল কুবরা: ৫/৫৩৮)

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, যে বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদের গুরুত্ব সর্বাধিক, সে পরিস্থিতিতেও কিন্তু অন্য ফরযগুলো ফরয হিসেবেই থেকে যায়। অতএব, সেগুলোও আদায় করতে হবে। তবে একান্তই যদি আদায়ের সুযোগ না

হয়, তাহলে যে ফরয আপাতত পিছিয়ে দিলে চলে সেটাকে পিছিয়ে দিয়ে পরে আদায় করে নিতে হবে।

আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় জিহাদ ও অন্য সকল ফরযের মাঝে সমন্বয় করা জরুরী। কেননা, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদের সাথে অন্যান্য ফরয আদায় করা সম্ভব। অতএব, জিহাদের ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব দিতে হবে, অন্য সকল ফরযের ব্যাপারেও তেমনি গুরুত্ব দিতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে মিম্বারুত তাওহিদ থেকে একটি সুওয়াল-জওয়াব উল্লেখ করছি-

هل أقدم الحج على الجهاد؟ ... رقم السؤال: 2911

اذا كان المسلم يريد الخروج للجهاد ولم يحج حيث ان موعد الخروج قبل شهر الحج فهل يخرج قبل الحج او يفوت الخروج ويحج؟

السائل: محب ابى عبدالله

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على نبيه الكريم ... وعلى آله وصحبه أجمعين. ... وبعد: ... إذا كان هذا الأخ المجاهد ممن يحتاج إليه المجاهدون ويشق عليهم تأخره عنهم فعليه في هذه الحالة أن يقدم النفير ويعجل بمعونة إخوته المجاهدين. ... وأما إذا كانوا يحتملون تأخره عنهم بلا مشقة فعليه في هذه الحالة أن يبدأ بفريضة الحج ويثني بفريضة الجهاد. ... ففي ذلك جمع بين الفريضتين، وتقديم للمضيق وقته على الموسع وقته. ... والله أعلم ... والحمد لله رب العالمين.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية: ... الشيخ أبو المنذر الشنقيطي

"জিহাদের আগে কি হজ্ব যাব?

প্রশ্ন:

একজন মুসলমান জিহাদে যেতে চান। তিনি এখনও হজ্ব করেননি। কথা হয়েছে যে, হজ্বের একমাস পূর্বে তিনি জিহাদে যাবেন। তিনি কি হজ্ব করার আগে জিহাদে যাবেন, না'কি জিহাদ রেখে হজ্বে যাবেন?

উত্তর:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ... الحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على نبيه الكريم ... وعلى آله وصحبه أجمعين. ... وبعد:

এই মুজাহিদ ভাই যদি এমন হন যে, তাকে মুজাহিদগণের প্রয়োজন আছে এবং তিনি পিছনে থেকে গেলে মুজাহিদগণের কষ্ট হবে- তাহলে তাকে জিহাদে বের হওয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আগে তার মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতায় নিয়োজিত হতে হবে।

আর যদি এমন হন যে, কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই তার মুজাহিদ ভাইগণ তার পিছেনে রয়ে যাওয়া বরদাশত করে নিতে পারবেন- তাহলে বর্তমান অবস্থায় তাকে আগে ফরয হজ্ব আদায়ের কাজ শুরু করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জিহাদ করবেন। এতে উভয় ফরয আদায় করা সম্ভব হবে। তবে যে ফরযের সময় সংকীর্ণ (ফলে সেটাকে পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই) সেটাকে যে ফরযের সময় প্রশস্ত (ফলে তা পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ আছে) সেটার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

والله أعلم

... والحمد لله رب العالمين

উত্তর প্রদানে:

শায়খ আবুল মুনযির আশশানকীতি

সদস্য: শরয়ী বিভাগ, মিম্বারুত তাওহিদ"

-মিম্বারুত তাওহিদ, প্রশ্ন নং ২৯১১

মোটকথা- নিঃশর্তভাবে জিহাদকে সকল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ট বলা যায় না। কেননা, আরকানে খামসার গুরুত্ব সর্বাধিক। তবে এ কথা বলা যায়- সকল নফল ইবাদতের চেয়ে জিহাদ শ্রেষ্ট। তদ্রূপ, শত্রু মাথার উপর এসে গেলে তখন জিহাদের গুরুত্ব সর্বাধিক। এর প্রয়োজনে তখন অন্যান্য ফরয পিছিয়ে দিয়ে পরে আদায় করা যাবে। তবে যদি সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়, তাহলে সবগুলোই যথারীতি যথা সময়ে আদায় করতে হবে। যারা মনে করেন, জিহাদ ফরয হয়ে গেলে আর কোন ফরয ফরযই থাকে না, তারা ভুল করছেন। তদ্রূপ যারা অন্যান্য ফরযের বাহানা তুলে জিহাদ তরক করছেন তারাও ভুল পথে আছেন। সঠিক ও মধ্যমপন্থা হল- জিহাদ ও অন্য সকল ফরযের সমন্বয় সাধন। একটা করতে গিয়ে আরেকটা তরক করা যাবে না। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৭২০

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৮: দুই নির্বাসন

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-২০-২০১৮

দুই. নির্বাসন

কোন অপরাধীর বেলায় যদি মনে হয়, তাকে অন্যত্র নির্বাসন দিলে একাকিত্বের যাতনায় কিংবা নির্বাসিত এলাকার নেক পরিবেশে থেকে সে সংশোধন হয়ে যাবে, তাহলে তাকে অন্যত্র নির্বাসন দেয়া যেতে পারে। এতে এক দিকে সে নিজে সংশোধন হবে, অন্য দিকে লোকজন তার অনিষ্ট থেকে রেহাই পাবে।

এই নির্বাসনের কথা কোরআন ও হাদিসে এসেছে। আল্লাহ তাআলা রাহজানদের শাস্তির ব্যাপারে বলেন,

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যমিনে ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে- তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে ওদের নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়াতে ওদের লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" [মায়েদা: ৩৩]

অনেকের মতে এখানে **أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ** দ্বারা নির্বাসন উদ্দেশ্য। হাদিসে অবিবাহিত যিনাকারীর শাস্তিতে এক বৎসরের নির্বাসনের কথা এসেছে। মুসলিম শরীফে হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

(البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)

“অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে যিনা করলে তার শাস্তি: একশো বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন।” [সহীহ মুসলিম: ১৬৯০]

বুখারী শরীফে এসেছে,

عن زيد بن خالد الجهني قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام)

“হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিবাহিত যিনাকারীকে একশো বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন দেয়ার আদেশ দিতে শুনেছি।”[সহীহ বুখারী: ৬৪৪৩]

অন্য হাদিসে এসেছে- এক লোক এক বাড়িতে কর্মচারি ছিল। সে বাড়ির মালিকের স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর হদ কায়েম করেন। কর্মচারি লোকটি অবিবাহিত ছিল তাই তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেন। আর মালিকের স্ত্রী বিবাহিত হওয়ায় তাকে রজম করে হত্যা করেন। [সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতিল্লাতি লা তাহিল্লু ফিলহুদুদ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি’তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।]

সাহাবায়ে কেরাম থেকেও নির্বাসনের ঘটনা বর্ণিত আছে। তবে আমাদের আইম্মায়ে কেরামের মতে এগুলো হদ হিসেবে নয়, তা’যির হিসেবে। অতএব, যার ক্ষেত্রে উপযোগী মনে হয়, তাকেই শুধু নির্বাসন দেয়া হবে; যাকে নির্বাসন দিলে তার নিজের বা অন্যদের ফিতনার আশঙ্কা আছে, তাকে নির্বাসন দেয়া যাবে না। হযরত উমর রাদিল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এমনই বর্ণিত আছে।

হিদায়া গ্রন্থকার (৫৯৩হি.) বলেন,

"إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى" وذلك تعزير وسياسة لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. اهـ

“তবে যদি ইমামুল মুসলিমীন নির্বাসন দেয়াতে মাসলাহাত রয়েছে মনে করেন, তাহলে যত দিন মুনাসিব মনে করেন নির্বাসন দিতে পারেন। এটি হবে তা’যির ও সিয়াসতরূপে। কেননা, কোন কোন অবস্থায় এটি উপকারী হয়। কাজেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ভার ইমামের উপর ন্যাস্ত। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কারো কারো থেকে বর্ণিত নির্বাসন দেয়ার ঘটনাকে এর উপরই প্রয়োগ করা হবে।” [আলহিদায়া: ২/১৮৪]

আল্লামা শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

)قوله ويكون بالنفي عن البلد) ومنه ما مر من نفي الزاني البكر ونفي عمر- ﷺ - نصر بن حجاج لافتتان النساء بجماله وفي النهر عن شرح البخاري للعيني أن من آذى الناس ينفى عن البلد. اهـ

“দুররে মুখতার গ্রন্থকারের বক্তব্য [নিজ জনপদ থেকে নির্বাসন দেয়ার মাধ্যমেও তা’যির হতে পারে।] - অবিবাহিত যিনাকারীকে নির্বাসন দেয়ার কথা যা আগে গেছে, সেটা এর মধ্যেই পড়ে। নসর ইবনে হাজ্জাজের সৌন্দযের কারণে মহিলারা যখন ফিতনার শিকার হচ্ছিল, তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নির্বান দিয়েছিলেন। এটাও এর মধ্যেই পড়ে। আননাহরুল ফায়েক্বে আইনী প্রণীত বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি লোকজনকে কষ্ট দেবে, তাকে নিজ জনপদ থেকে অন্যত্র নির্বাসন দিয়ে দেয়া হবে।” [রদ্দুল মুহতার: ৪/৬৪]

আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

وفعل الصحابة محمول على أنهم رأوا ذلك مصلحة على طريق التعزير ، ألا يرى أنه روي عن سيدنا عمر ﷺ أنه نفى رجلا فلحق بالروم فقال : لا أنفي بعدها أبدا .

وعن سيدنا علي ﷺ أنه قال : كفى بالنفي فتنة؛ فدل أن فعلهم كان على طريق التعزير ، ونحن به نقول : إن للإمام أن ينفي إن رأى المصلحة في التغريب ، ويكون النفي تعزيرا لا حدا. اهـ

“সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত নির্বাসন দেয়ার ঘটনা এর উপর প্রয়োগ হবে যে, তা’যিররূপে তারা তা উপকারী মনে করেছেন। আপনি কি দেখেন না- হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নির্বাসন দিলে সে রোমানদের সাথে গিয়ে মিলে যায়। তখন তিনি বলেন, ‘এরপর আর কখনও আমি নির্বাসন দেব না।’

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘ফিতনার জন্য নির্বাসনই যথেষ্ট।’ অতএব, বুঝা গেল- তারা তা করেছেন তা’যিররূপে। আমরাও এ অভিমত পোষণ করি যে, যদি মাসলাহাত মনে করেন, তাহলে ইমামুল মুসলিমীন নির্বাসন দিতে পারেন। এ নির্বাসন হবে তা’যির, হদ না।” [বাদায়িউস সানায়ি’: ১৫/৫২]

পোস্টের লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৮২৮

জিহাদ-কিতাল: কাকে বলে ও কত প্রকার; এক ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-২৩-২০১৮

এক ভাই জানতে চেয়েছেন:

১. জিহাদ কাকে বলে ?

২. জিহাদ কত প্রকার ও কি কি ?

৩. ক্বিতাল কাকে বলে ?

৪. ক্বিতাল কত প্রকার ও কি কি ?

৫. ২ টার মাঝে পার্থক্য কি কি ?

উত্তর:

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

মুহতারাম ভাই, কমেন্টে রিপ্লাই দিয়েছিলাম। তবে শুধু এতুটুকুতে হয়তো আপনার চাহিদা পূরণ হবে না। তাই রিপ্লাইটা সহ এখানে আরেকটু বিস্তারিত বলছি।

এক. জিহাদ কাকে বলে?

উত্তর: আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে কাফের-মুরতাদদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা কিংবা জান-মাল ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাতে কোন ধরণের সহায়তা করাকে জিহাদ বলে। আমীরের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী যে যেভাবে সহায়তা করবে সবই জিহাদ হবে। যে যতটুকু কুরবানী দেবে সে ততটুকু সওয়াব পাবে। আশাকরি বুঝতেই পারছেন- জিহাদ বলতে শুধু যুদ্ধ নয়; কাফেরদের বিরুদ্ধে জয় লাভের জন্য যুদ্ধ এবং আমীরের নির্দেশনাধীন যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অন্য সকল কাজও জিহাদ।

দুই. জিহাদ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: জিহাদ দুই প্রকার:

১. ইকদামি তথা আক্রমণাত্মক জিহাদ। কাফেরদের দেশ বিজয় করে সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য এ জিহাদ করা হয়। এটি ফরযে কেফায়া।

২. দিফায়ী তথা প্রতিরক্ষামূলক। কাফেররা মুসলমানদের উপর বা তাদের কোন ভূমিতে আক্রমণ চালালে তা প্রতিহত করা ফরয। একে দিফায়ি জিহাদ বলে। এটি ফরযে আইন।

ফরযে কিফায়া ও ফরযে আইন কাকে বলে, ফরযে আইন কতজনের উপর হয়- কয়দিন আগে এ সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত পোস্ট দেয়া হয়েছিল। আপনি সেটা দেখতে পারেন।

লিংক:

https://dawahilallah.com/showthread....২৫০৩;&%২৩২৪৭২;

জিহাদের প্রকারের ব্যাপারে আপনি এই লেখাটা দেখতে পারেন। এখানে উভয় প্রকার জিহাদ (ইকদামি ও দিফায়ি) সম্পর্কে দলীলভিত্তিক আলোচনা আছে।

লেখাটা বিজয়ে লেখা, তাই এখানে পোস্ট করতে পারছি না।

https://my.pcloud.com/publink/show?c...০fQqkTajSkztoy

জিহাদের সংজ্ঞা ও প্রকারের গোছানো আলোচনা আপনি 'ফাযায়েলে জিহাদ' কিতাবে পাবেন। পৃষ্ঠা: ৩-৩৪

এক ভাই সেটার লিংক দিয়েছেন:

https://my.pcloud.com/publink/show?c...aeyA৭sYQdQnJJX

তিন. কিতাল কাকে বলে?

উত্তর: কিতাল অর্থ- যুদ্ধ, লড়াই। কিতালের জন্য দু'টি পক্ষ থাকা জরুরী।

চার. কিতাল কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: মুহতারাম ভাই, এ প্রশ্নের দ্বারা আপনার কি উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে বললে হয়তো উত্তর দেয়া যাবে। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, কিতাল দুই

প্রকার:

১. দ্বীনের জন্য কিতাল: এটা জিহাদ হবে। সওয়াব পাওয়া যাবে। নিহত হলে শহীদ হবে।

২. দুনিয়ার জন্য কিতাল: এটা ফাসাদ ও সন্ত্রাস হবে। গুনাহগার হবে। নিহত হলে বা অন্যকে হত্যা করলে জাহান্নামী হবে।

যেমন- এক হাদিসে হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এসেছে-

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.

"এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে আরজ করলো- কেউ যুদ্ধ করে গনিমতের লোভে, কেউ যুদ্ধ করে প্রশংসা লাভের জন্য আর কেউ যুদ্ধ করে তার বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। এদের কার যুদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ) গণ্য হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, আল্লাহর কালিমা বুলন্দীর জন্য যে যুদ্ধ করে, তারটাই কেবল আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হবে।" (সহীহ বুখারী: ২৮১০, সহীহ মুসলিম: ৫০২৮)

অন্য হাদিসে হযরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال :إنه كان حريصا على قتل صاحبه .

"দুই মুসলমান যদি (না-হক্ব) পরস্পর তরবারি নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হবে। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হত্যাকারী জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামী হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন- কারণ, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যার আকাংখায় ছিল।" (সহীহ বুখারী: ৬৮৭৫, সহীহ মুসলিম: ৭৪৩৪)

পাঁচ. জিহাদ ও কিতালের মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর: জিহাদ ব্যাপকার্থবোধক, যার মাঝে কিতাল এবং কিতাল সংশ্লিষ্ট সকল কাজ অন্তর্ভূক্ত। যেমন- মুজাহিদদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, খানা-পিনার ব্যবস্থা করা, আহত মুজাহিদদের চিকিৎসা করা, জিহাদে অর্থ প্রদান, বুদ্ধি-পরামর্শ বা টেকনোলোজি দিয়ে মুজাহিদদের সহায়তা- ইত্যাদি সব কিছু জিহাদে শামিল।

আর কিতাল হল জিহাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ মারহালা। অতএব, জিহাদ শুধু কিতালের মাঝেই সীমাবদ্ধ না। কিতাল জিহাদের চূড়ান্ত পর্ব। এই মারহালায় পৌঁছতে এবং তা চালিয়ে নিতে অন্য যত কাজের প্রয়োজন সবগুলোই জিহাদ। তবে তা মনমতো হলে হবে না, আমীরের নির্দেশনায় হতে হবে।

মুহতারাম ভাই, আপাতত এতটুকুই উত্তর দিলাম। যদি আপনার প্রশ্নের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা করে বললে ইনশাআল্লাহ উত্তর দেয়া যাবে।
ওয়াসসালাম।

কমেন্ট

Taalibul ilm

Super Moderator

০৯-২৩-২০১৮

মাশাআল্লাহ, সুন্দর হয়েছে ভাই...

আমি একটি বাস্তব উদাহরণ যোগ করতে চাই ইনশাআল্লাহ... বর্তমানে প্রতিটি দেশেই একটি সেনাবাহিনী থাকে। এক কথায় তাদের মূল কাজঃ যুদ্ধ করা। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যায়, এ সকল সেনাবাহিনীর মধ্যে আছে বিভিন্ন বিভাগ।

যেমনঃ
- মেডিক্যাল কোর - এদের কাজ সেনাবাহিনীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- ডেন্টাল কোর - এদের কাজ সেনাবাহিনীর দাঁতের চিকিৎসা করা। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- এএফএনএস (Armed Forces Nursing Service) - এদের কাজ সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন সিএমএইচ এ নার্স এর সেবা প্রদান করা। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- এডুকেশন কোর - এদের কাজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষা (বিএসসি, বিকম এ রকম সাধারণ কলেজ-ভার্সিটির পড়ালেখা) প্রদান। যুদ্ধ বিষয়ক কোন শিক্ষা না। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- ইলেক্ট্রিকাল ও ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর - এদের কাজ সেনাবাহিনীর গাড়ী ও সরঞ্জাম মেরামত ইত্যাদি। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- আরভিএফসি (Remount, Veterinary and Farms Corps) - এদের কাজ ঘোড়া প্রতিপালন, গরুর খামার করে সেনাবাহিনীকে গরুর দুধ খাওয়ানো। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- এসিসি (Army Corps of Clerks) - এদের কাজ সেনাবিহিনীর বিভিন্ন অফিসে ক্লার্কের কাজ করা। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- অর্ডন্যান্স - এদের কাজ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমনঃ অস্ত্র, গুলি, গাড়ী, গাড়ীর তেল, রেশন, ইউনিফর্ম ইত্যাদি কেনা-কাটা ও পৌছানো। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- সিগনালস - এদের কাজ চিঠি, ওয়ারলেস, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও হেডকোয়ার্টারের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা। এটি এদের একমাত্র কাজ। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- সার্ভিস কোর - এদের কাজ সেনাবাহিনীকে গাড়ী দিয়ে কোথাও পৌঁছানো, রেশন ইত্যাদি পৌঁছানো। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- এফসি - ফাইনান্সিয়াল কন্ট্রোলার - এরা সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা ইত্যাদি হিসাব রাখে। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- আইএসপিআর - এদের কাজ মিডিয়াতে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিবৃতি, বক্তব্য ইত্যাদি প্রচার করা। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- ডিজিডিপি - ডিফেন্স পারচেজ - এদের কাজ সকল বাহিনীর সরঞ্জাম ক্রয় করা। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

- জিই - গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার - এদের কাজ সেনাবাহিনীর বাসস্থান, রাস্তাঘাট, লাইট-ফ্যান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা। এটি এদের একমাত্র কাজ। যুদ্ধ / সম্মুখ-যুদ্ধ / কিতাল এদের অদৌ কোন কাজ নয়।

সূত্র - https://www.army.mil.bd/Arms-and-Services

লিংক থেকে দেখা যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর এতগুলো বিভাগের মধ্যে হাতেগুনা ৩/৪টি ছাড়া বাকী সবই কিন্তু উপরের এই বিভাগগুলো। উপরের সকল কোর / বিভাগই কিন্তু সেনাবাহিনীর পোশাক পরে (নার্স ছাড়া)। এদেরকে সবাই সেনাবাহিনী বলে। তারা সেভাবেই বেতন পায়। সমাজে সেনাবাহিনী পরিচয় দিয়েই চলে।

কিন্তু মূল যুদ্ধে সরাসরি ফাইট / শত্রুকে আঘাত করা / হত্যা করা / আক্রমণ করা / এমনকি নিজেদের দখলে থাকা জায়গা রক্ষা করাও এদের কাজ না। এদের একমাত্র কাজ তাই যা তার নামের পাশে আছে। তবে যুদ্ধের ময়দানে গেলে ব্যক্তিগতভাবে আত্মরক্ষার সুযোগ তারও আছে।

তো এদের সবার কাজই আসলে গাইরে কিতাল (কিতাল নয়)। কিন্তু এই সকল কাজই জিহাদের কাজের মধ্যে সামিল। এদের কাজগুলো সাধারণভাবে যুদ্ধের কাজ, যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজ। তাদেরকেও সবাই আর্মি বলে। যদিও তাদের মূল কাজ / উদ্দেশ্য অদৌ শত্রুকে আঘাত করা / কিতাল নয়।

তবে কথা হল - এ সকল সেনাবাহিনী কিতাল করে তাগুতের পথে। আর মুজাহিদরা কিতাল করেন আল্লাহর পথে।

একইভাবে কিতালরত মুজাহিদিনের জন্য উপরের বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট দরকার। এই সাপোর্ট সবগুলোই জিহাদের আওতায় পরবে ইনশাআল্লাহ।

- যারা মুজাহিদিনের চিকিৎসা করেন

- যারা মুজাহিদিনকে দাওরা শরীয়াহ করান, শরীয়াতের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেন, জানিয়ে দেন কিংবা অন্য যে কোন শিক্ষা দেন

- যারা মুজাহিদিনের গাড়ী / যান-বাহন মেরামত করেন

- যারা মুজাহিদিনের আসলিহাত ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করেন

- যারা মুজাহিদিনকে এবং তাদের আসলিহাত-সরঞ্জাম ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেন

- যারা মুজাহিদিনের বিভিন্ন রিপোর্ট / ফাইল ইত্যাদি তৈরি ও দেখভাল করেন

- যারা মুজাহিদিনের যোগাযোগ ব্যবস্থা / ফোরাম ইত্যাদি দেখভাল করেন

- যারা মুজাহিদিনের আর্থিক যোগান দেন

- যারা মিডিয়াতে কাজ করেন

- যারা আনসার হিসেবে ঘরের সাপোর্ট দেন

এসবই আসলে বাস্তবে সকল বাহিনীর দরকার হয়। মুজাহিদিনেরও দরকার। আর এ সবই আল্লাহর পথে করা হলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

মহান রব যেন আমাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে জিহদ ফি সাবিলিল্লাহতে শরীক থাকার সুযোগ দান করেন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৮৬৩

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ০৯- তিন-চার. বন্দী ও প্রহার

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-০২-২০১৮

তিন. বন্দী করে রাখা

এখানে জেলে বন্দী বা নিজ গৃহে নজরবন্দী উভয়টাই উদ্দেশ্য। কোরআন সুন্নাহয় এ উভয়টাই এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

"তোমাদের নারীদের মধ্য হতে যারা অশ্লীল কাজ করবে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী রাখবে। তারা সাক্ষ্য দিলে সেসকল নারীকে গৃহে বন্দী করে রাখবে, যাবৎ না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা দেন।" [নিসা: ১৫]

ইসলামের শুরু যামানায় যিনার নির্ধারিত কোন শাস্তি ছিল না। সে সময়ে ব্যবস্থা ছিল- যিনায় লিপ্ত নারীদের গৃহে বন্দী করে রাখা। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। অবিবাহিতদের জন্য একশো বেত্রাঘাত আর বিবাহিতদের জন্য রজম করে হত্যা নির্ধারিত হয়েছে।

এ আয়াত যদিও মানসূখ হয়ে গেছে, তবে এ থেকে এতটুকু বুঝে আসে যে, যেসকল অপরাধের জন্য শরীয়তে নির্ধারিত কোন শাস্তি নেই, সেসবের ক্ষেত্রে বন্দী করে রাখা একটা শাস্তি হতে পারে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] قد يستدل بذلك على أن المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه. اهـ

"আল্লাহ তাআলার বাণী: [সেসকল নারীকে গৃহে বন্দী করে রাখবে, যাবৎ না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা দেন।] এ থেকে এ বিষয়ে দলীল দেয়া যায় যে, অপরাধীর ব্যাপারে যদি শরীয়তের বিধান জানা না যায়, তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে আটক করে রাখা হবে। বিধান জানা গেলে তখন বাস্তবায়ন করা হবে।" [আলফাতাওয়াল কুবরা: ৫/৫২৭]

এক হাদিসে এসেছে,

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: (أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه)

"হযরত বাহয ইবনে হাকিম তার পিতৃসূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন- অভিযোগের ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বন্দী করেছিলেন। এরপর (নির্দোষ প্রমাণিত হলে) তাকে ছেড়ে দেন।" [তিরমিযি: ১৪১৭, আবু দাউদ: ৩৬৩০]

সাহাবায়ে কেরাম থেকে বন্দী করে রাখার অজস্র ঘটনা বর্ণিত আছে।

চার. প্রহার

প্রহার তা'যিরের অত্যধিক প্রসিদ্ধ পন্থা। বরং তা'যির বলতে যেন সাধারণত প্রহারকেই বুঝিয়ে থাকে। কোরআন সুন্নাহয় প্রহারের দ্বারা তা'যিরের কথা এসেছে। খুলাফায়ে রাশিদিনসহ পরবর্তী সকল যুগে প্রহারের মাধ্যমে তা'যিরের ধারা চলে আসছে।

কোরআনে কারীম থেকে সূরা নিসার পূর্বোল্লিখিত ৩৪ নং আয়াত এর দলীল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا{

"যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদেরকে (প্রথমে) বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় শয়ন ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদের প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। নিশ্চিত জেনো- আল্লাহ সবার উপরে, সবার বড়।" **[**নিসা: ৩৪**]**

এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم أَبناءُ سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشْر ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع(

"তোমাদের সন্তানরা যখন সাত বৎসরে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে নামাজের আদেশ কর। আর দশ বৎসরে উপনীত হলে তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।" **[**আবু দাউদ: ৪৯৫**]**

এখানে নাবালেগকে নামায তরক করার কারণে প্রহারের আদেশ দেয়া হয়েছে, অথচ নাবালেগের উপর শরীয়তের বিধি বিধান বর্তায় না; তাছাড়া নামায না পড়ার দ্বারা শুধু ব্যক্তির নিজেরই ক্ষতি হয়, অন্যের ক্ষতি হয় না। তাহলে বালেগ ব্যক্তিদের এবং ঐ সকল অপরাধ, যেগুলোর দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয় বা হক নষ্ট হয়- সেগুলোতে এর আগেই প্রহার বৈধ হবে।

অন্য হাদিসে এসেছে,

(لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)

"আল্লাহ তাআলার কোন হদ ভিন্ন অন্য কোথাও দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না।" **[**সহীহ বুখারী: ৬৪৫৬**]**

এখানে হদ দ্বারা গুনাহ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ গুনাহ নয় এমন বিষয়ে দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না। অর্থাৎ আদব-কায়দা ও সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বৈধ রীতি-নীতির বিপরীত করলে, যদি তা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহের পর্যায়ে না পড়ে,

তাহলে বেত্রাঘাত করা যাবে, তবে দশের অধিক নয়। আর কোন গুনাহে লিপ্ত হলে তখন মুনাসিব মতো দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে।

এক হাদিসে এসেছে, নিজ স্ত্রীর বাঁদিকে বৈধ মনে করে সহবাস করলে একশো বেত্রাঘাত লাগানো হবে। [সহীহ বুখারী: ২২৯০, মুসনাদে আহমাদ: ১৪৫১]

কোরআনে কারীমের মুতাশাবিহ আয়াত নিয়ে ফিতনা সৃষ্টির অপরাধে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের সাবিগ ইবনে ইসলকে পেটাতে পেটাতে রক্তাক্ত করেছেন। [সুনানে দারেমী: ১৪৪] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে দুইশত বেত্রাঘাত করেছেন। [মুসনাদে বাযযার: ২৯৯]

মোটকথা: প্রহারের দ্বারা তা'যির বৈধ। তবে এর সর্বোচ্চ পরিমাণ কত হবে তা নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। সামনে এর আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১০৩১

দল করা সম্পর্কে সৌদি উলামা পরিষদের ফতুয়া

সত্য প্রকাশ

Member

১০-১৬-২০১৮

দল সম্পর্কে সৌদি আরবের উলামা পরিষদের ফতুয়া,

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রসুলিল্লাহ আম্মা বা'আদ,

মুক্বীম অবস্থায় 'ইমারত' বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কে সঊদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের ফৎওয়া

প্রশ্ন: মুক্বীম অবস্থায় 'ইমারত' বা কাউকে আমীর বানানো জায়েয আছে কি? অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনজন সফর অবস্থায় থাকলে তাদের একজন তাদের 'আমীর' হবে; উক্ত হাদীছের আলোকে মুক্বীম অবস্থায় কোনো দেশে কোনো দলের 'আমীর' হওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর: আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রাহরাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাবলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন তাদের একজনকে তাদের আমীর বানাবে' *(আবূ দাঊদ, সনদ 'হাসান')*। উক্ত হাদীছ দ্বারা সফর অবস্থায় আমীর বানানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সুতরাং মুক্বীম অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি আমীর হবে।[১]

প্রশ্ন:বিভিন্ন ইসলামী দলের উত্থান হয়েছে এবং হচ্ছে, দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে যাদের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন এবং তারা সবাই সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আসনটি অলংকৃত করতে চায়- এক্ষণে উক্ত ইসলামী দলসমূহের উত্থানের ব্যাখ্যা আমরা কিভাবে করতে পারি? তারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিম্নোক্ত হাদীছের আওতায় পড়বে? 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি ব্যতীত তাদের সবাই জাহান্নামে যাবে'। কিভাবে আমরা বিভিন্ন দল যেমন: ইখওয়ানী, খালাফী,

[1] সঊদী আরবের স্থায়ী ফৎওয়া বোর্ড, ১৮১৮৮ নং ফৎওয়ার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

সালাফী, তাকফীর ওয়া হিজরা, তাবলীগী, ছূফী ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করব?

উত্তর: আল্লাহর দ্বীন একটিই এবং সেদিকে আহ্বানের পদ্ধতিও একটিই। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পদ্ধতির উপর চলবে, সে-ই সঠিক কাজটি করবে। আল্লাহই একক তাওফীক্বদাতা।[২]

প্রশ্ন: আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, আমাকে সর্বদা বিভিন্ন মতবাদ এবং দলের মধ্যে বসবাস করতে হয়। তাদের সবাই নিজের দলকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করে নিজেদের সহযোগী সদস্য বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকে। যেমন: 'জামা'আতুল ইখওয়ান', 'তাবলীগ জামা'আত (যারা ৪০ দিন, ৪ মাস চিল্লায় বের হয়)', 'জামা'আতু আনছারিস-সুন্নাহ', আব্দুল হামীদ ছাহেবের 'জামা'আহ ইছলাহিইয়াহ' ইত্যাদি। এক্ষণে আমাদেরকে সঠিক পথটি বাৎলে দিবেন বলে আশা করছি।

উত্তর: নির্দিষ্টভাবে কোনো জামা'আতের পক্ষাবলম্বন না করে হক ও দলীলভিত্তিক বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকা তোমার জন্য যরূরী। তবে কোনো দলসালাফে ছালেহীনের অনুসৃত ছহীহ আক্বীদার সংরক্ষক হলে তাদেরকে সহযোগিতা করা যেতে পারে। যাহোক, তোমার কর্তব্য হচ্ছে, কোরআন ও ছহীহ সুন্নাহর প্রতি আমল করা এবং যাবতীয় বিদ'আত ও কুসংস্কার বর্জন করে চলা। আল্লাহ তাওফীক্ব দান করুন।[৩]

প্রশ্ন: বর্তমান বিদ্যমান বিভিন্ন দল ও জামা'আত, যেমন: 'ইখওয়ানী', 'তাবলীগী', 'আনছারুস-সুন্নাহ', 'জাম্*ইয়্যাহ শার্*ইয়্যাহ', 'সালাফী', 'তাকফীর ওয়াল হিজরা', যেগুলি বর্তমানে মিশরে রয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এসব দলের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের কি ধরনের ভূমিকা হতে পারে? এসব দলের ক্ষেত্রে কি রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হুযায়ফারাদিয়াল্লাহু 'আনহুরাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রযোজ্য হবে? 'গাছের শিকড় কামড়ে ধরে হলেও মৃত্যু অবধি তুমি উক্ত দলগুলির সবই পরিত্যাগ করে চলবে'। *(ছহীহ মুসলিম)*

---

[2] প্রাগুক্ত, ৬৮০০ নং ফৎওয়ার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

[3] প্রাগুক্ত, ৪০৯৩ নং ফৎওয়ার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত দলগুলির প্রত্যেকটিতে কিছু হকও আছে, কিছু বাতিলও আছে, অনুরূপভাবে আছে কিছু ভুল-ভ্রান্তি, আবার আছে কিছু সঠিক দিক। ঐসব দলগুলির কোনো কোনটি অন্যগুলির তুলনায় হকের অধিকতর নিকটবর্তী এবং অধিকতর কল্যাণময়। সেজন্য আপনার উচিৎ, প্রত্যেকটি দলকে তাদের সাথে বিদ্যমান হকের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা; আর বাতিল ও ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রে তাদেরকে নছীহত করা। যেসব বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, সেগুলো পরিত্যাগ কর। আর যেসব বিষয়ে তোমার সন্দেহ না হয়, সেগুলো গ্রহণ কর। আল্লাহই একক তাওফীক্বদাতা।[৪]

প্রশ্ন: মুসলিমদেরকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেওয়া এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করা সত্ত্বেও কি প্রত্যেকটি মুসলিমের কোনো না কোনো ইসলামী দলে থাকা এবং সেই দলের 'আমীরে জামা'আত' থাকা যরূরী?

উত্তর: প্রত্যেক মুসলিমের কথা, কাজে ও বিশ্বাসে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহর বক্তব্যকে অনুসরণ করে চলা উচিৎ। অনুরূপভাবে তার কর্তব্য হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা বা তাকে ঘৃণা করা এবং কেবলমাত্র তাঁর খুশীর জন্যই কারো সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা বা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা।[৫]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১২২০

[৪] প্রাগুক্ত, ৬২৮০ নং ফৎওয়ার চতুর্থ প্রশ্ন।
[৫] প্রাগুক্ত, ৬২৮০ নং ফৎওয়ার চতুর্থ প্রশ্ন।

ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

Talhah Bin Ubaidullah

Senior Member

১১-০৪-২০১৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

প্রশ্ন: আমি শুনেছি 'গণতন্ত্র' ইসলাম থেকে নেয়া হয়েছে। এ কথাটা কি ঠিক? গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচারণা করার হুকুম কি?

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক: ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) আরবী শব্দ নয়। এটি গ্রিক ভাষার শব্দ। দুটি শব্দের সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: Demos অর্থ- সাধারণ মানুষ বা জনগণ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে-KRATIA অর্থ- শাসন। অতএব, ডেমোক্রেসি শব্দের অর্থ হচ্ছে- সাধারণ মানুষের শাসন অথবা জনগণের শাসন।

দুই: গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি (পার্লামেন্ট সদস্য) এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বরং জনগণ ও জনপ্রতিনিধির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যেসব আইন মেনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবেক ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। উদাহরণতঃ এই তন্ত্রের অধীনে গর্ভপাত করা, সমকামিতা, সুদি মুনাফার

বিধান ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। ইসলামি শাসনকে বাতিল করা হয়েছে। ব্যভিচার ও মদ্যপানকে বৈধ করা হয়েছে। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতিহত করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা কেউ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): "অতএব, হুকুম দেওয়ার অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর জন্য" [সূরা গাফের, আয়াত: ১২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন (ভাবানুবাদ): "আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আল্লাহ কি হুকুমদাতাদের শ্রেষ্ঠ নন?" [সূরা ত্বীন, আয়াত: ০৮] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): "বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করেছে- তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গায়েব বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন! তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি নিজ হুকুমে কাউকে অংশীদার করান না।"[সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৬] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): "তারা কি জাহেলিয়াতের হুকুম চায়? বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে?"[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা। তিনি জানেন, কোন বিধান তাদের জন্য উপযুক্ত; কোন বিধান তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। সব মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস এক রকম নয়। নিজের জন্য কোনটা উপযোগী মানুষ সেটাই তো জানে না; থাকতো অন্যের জন্য কোনটা উপযুক্ত সেটা জানবে। এ কারণে যে দেশগুলোতে জনগণের প্রণীত আইনে শাসন চলছে সে দেশগুলোতে বিশৃঙ্খলা, চারিত্রিক অবক্ষয়, সামাজিক বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তবে কিছু কিছু দেশে এ তন্ত্রটি নিছক একটি শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়; যার কোনরূপ বাস্তবতা নেই। এ শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দেয়া উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহযোগীরাই হচ্ছে- আসল শাসক এবং জনগণ হচ্ছে তাদের করদ। এর চেয়ে বড় প্রমাণের আর কি প্রয়োজন আছে, শাসকবর্গ যা

অপছন্দ করে ডেমোক্রেসিতে যদি এমন কিছু থাকে তখন তারা সেটাকে পায়ের নীচে পিষ্ট করে। নির্বাচনে কারচুপি, স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললে টুটি চেপে ধরা ইত্যাদি এমন কিছু বাস্তবতা যা সকলের জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। দিনের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য যদি দলিল লাগে তাহলে বিবেকে আর কিছু ধরবে না।

'মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব আল-মুআসেরা' গ্রন্থ (২/১০৬৬) তে এসেছে-পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি: এটি এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যাতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের নির্বাচনে গঠিত পরিষদের মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। সে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. ভোট দেওয়ার অধিকার: জনগণের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ কোন একটি আইনের বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বিল উত্থাপন করে। এরপর পার্লামেন্ট কমিটি সেটার উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

২. গণভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর জনগণের রায় প্রকাশ করার জন্য পেশ করা।

৩. না-ভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন প্রকাশ করার নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক লোকের পক্ষ থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অধিকার। যাতে করে এ আপত্তির ফলে গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদি হ্যাঁ-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে আইনটি কার্যকর করা হয়। আর যদি না-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে সেটি বাতিল করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল সংবিধান এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দেহ নেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নব্য শিরকের স্বরূপমাত্র। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কিছু নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান

দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।”।[সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫৭] সমাপ্ত।

তিন: অনেক মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মানে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও ‘স্বাধীনতা’ ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝাতে চাই: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চারিত্রিক স্খলনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেক। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রিসালাত, কোরআন, সাহাবায়ে কেরামের উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপর্দা, বেহায়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এ সবগুলো উম্মতের দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শিকলে এ স্বাধীনতা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কোরআনকে দোষারোপ করা অনুমোদন করে; কিন্তু ‘নাৎসিদের ইহুদি নিধন’ নিয়ে কথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিষেধ। বরং যে ব্যক্তি এ হত্যাযজ্ঞকে অস্বীকার করে তাকে শাস্তি দেয়া হয়, জেলে পুরা হয়। অথচ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; এটাকে যে কেউ অস্বীকার করতেই পারে।

যদি আসলেই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরকে নেয়ার সুযোগ দিল না কেন?! কেন তারা মুসলমানদের দেশগুলোকে উপনিবেশ বানাল, তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লিবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল অথবা ইতালিয়ানরা মিশরে গণহত্যা চালাচ্ছিল বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল? এসব স্বাধীনতার দাবীদারদের নিকটেও স্বাধীনতা কতগুলো নিয়ম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত; যেমন-

১- আইন: কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, সে রাস্তাতে সাধারণ চলাচলের বিপরীত দিকে চলবে বা গাড়ী চালাবে। অথবা লাইসেন্স ছাড়া কোন দোকান-পাট খুলবে। যদি সে বলে আমি স্বাধীন; কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না।

২- সামাজিক প্রথা: উদাহরণতঃ কোন নারী সাগর যাপনের পোশাক পরে কোন মৃতব্যক্তির শোকাহত বাড়ীতে যেতে পারে না! যদি বলে আমি স্বাধীন, মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, তাড়িয়ে দিবে। কারণ এটি প্রথার বিপরীত।

৩- সাধারণ রুচিবোধ: উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মানুষের সামনে বায়ু ত্যাগ করতে পারে না! এমনকি ঢেকুর তুলতে পারে না। যদি সে বলে, আমি স্বাধীন, তাহলে মানুষ তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

এখন আমরা বলতে চাই:

তাহলে আমাদের ধর্মের কেন এ অধিকার থাকবে না যে, আমাদের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করবে। যেমন- তাদের স্বাধীনতা বেশ কিছু বিষয় দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়েছে যে বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করতে পারে না?! কোন সন্দেহ নেই ইসলাম ধর্ম যা নিয়ে এসেছে এর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও মানুষের জন্য উপকার। নারীকে বেপর্দা হতে নিষেধ করা, মদপানে বারণ করা, শুকুর খেতে নিষেধ করা ইত্যাদি সব মানুষের শারীরিক, মানসিক ও জৈবনিক কল্যাণেই। কিন্তু ধর্ম যদি তাদের স্বাধীনতাকে বিধিবদ্ধ করে তখনি তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদের মত অন্য কোন মানুষ বা অন্য কোন আইনের পক্ষ থেকে আসে তখন তারা বলে "শুনলাম ও মানলাম"।

চার: কিছু মানুষ ধারণা করে- ডেমোক্রেসি শব্দটা ইসলামে 'শুরা' শব্দের প্রতিশব্দ। এটি কয়েকটি কারণে ভুল। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. শুরা বা পরামর্শ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কোরআন-হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে 'জনগণের শাসন' এ ধর্মের অকাট্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজিবকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনের বলে মদ বিক্রির বৈধতা দেয়া হয়েছে। ব্যভিচার ও সুদের বৈধতা দেয়া হয়েছে। এসব আইনের মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দিকে

আহ্বানকারীদের তৎপরতাকে কোণঠাসা করা হয়েছে। এ ধরণের কোণঠাসাকরণ ইসলামি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। শুরা পদ্ধতিতে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ আছে কি?!

২. শুরা কমিটি গঠিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে ফিকহ, ইলম, সচেতনতা ও চরিত্র ইত্যাদির একটা উন্নত মান বিদ্যমান থাকে। কারণ চরিত্রহীন ব্যক্তি বা বোকার সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফের বা নাস্তিকের সাথে পরামর্শ তো আরও দূরের কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিক পার্লামেন্ট: পূর্বোক্ত গুণগুলোর কোন বিবেচনা নেই। একজন কাফের, দুর্নীতিবাজ, নির্বোধ ব্যক্তিও পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্রের কি সম্পর্ক?!

৩. শাসক শুরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমিটির একজন সদস্য যে পরামর্শ দিয়েছেন তার দলিলের বলিষ্ঠতার কারণে তিনি সেটাই গ্রহণ করবেন। অন্য সদস্যদের মতামতের পরিবর্তে এই মতকে সঠিক মনে করবেন। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'অধিকাংশ সদস্যের' মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মেনে চলতে হবে।

অতএব, মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- তাদের ধর্মকে নিয়ে গৌরববোধ করা, তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া বিধানের প্রতি আস্থা রাখা; এ বিধান তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরিয়ত বিরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজের মুক্ততা ঘোষণা করা।

শাসক ও শাসিত সকল মুসলমানের কর্তব্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র বা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করার দাবী হচ্ছে- প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর শরিয়তকে সম্মান করা, নবীর আদর্শের অনুসরণ করা।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব (islamqa)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৩৯১

ইসলামপন্থী গণতান্ত্রিকদের উদ্দেশ্য, কিছু সংশয় এবং তার নিরসন!

খালিদ মুস্তাসির

Senior Member

১১-১৭-২০১৮

এক ভাই গণতন্ত্র নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। সেটাতে তিনি তাওহিদ ও জিহাদের নববী মানহাজের অনুসরণকারী ভাইদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং ইসলামপন্থীদের গণতন্ত্র করার ব্যাপারে কিছু যৌক্তিকতা দাড় করিয়েছেন! আজ আপনাদের সামনে সেই ভাইয়ের বিশ্লেষণধর্মী লেখাটির উপর আমার ব্যক্তিগত পর্যালোচনা পেশ করার নিয়ত করেছি , ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

প্রথমে ঐ ভাই প্রচলিত গণতন্ত্রকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন-

''প্রচলিত গণতন্ত্র কমপক্ষে দুই প্রকার:

১. সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে সেক্যুলারীয় এন্ড কামালীয় গণতন্ত্র। পশ্চিমা গণতন্ত্র মূলত এটিই।

২. কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীল গণতন্ত্র। অর্থাৎ ইসলামের সাথে আকীদাগত সাংঘর্ষিক জায়গুলোতে ব্যাখ্যায় যাওয়া এবং ইসলামের সাথে সংঘর্ষ দুর করার চেষ্টা করা। বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর বেশ অনেকগুলোতে এধরনের গণতন্ত্র চর্চিত হয়। যেমন পাকিস্তানের সংবিধানের শুরুতেই আছে, সবকিছুর বিধানদাতা একমাত্র অল্লাহ। বাংলাদেশের বড় দলগুলোর নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে থাকে যে, ইসলামবিরোধী কোন আইন করা হবে না।

এই দ্বিতীয় প্রকারটি মূলত গড়ে উঠেছে মুসলিম কমিউনিটির চাপে। দ্বিতীয় প্রকারটির কুফর এত সুস্পষ্ট না যে, এক্ষেত্রে দলগত তাকফীর করা যায়। বরং এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে আলাদা বিবেচনা করতে হবে। তবে দ্বিতীয় প্রকারটিও আসলে ইসলামসম্মত না। অনেকগুলো কারণে। এবং দ্বিতীয় প্রকারটি মেনে নেওয়া এবং গ্রহণ করা ইসলামী গায়রত ও আত্মমর্যাদাবিরোধী।''

তাঁর এই প্রকারভেদের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত নই। প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত গণতন্ত্রের কোন প্রকারভেদ নেই, বরং গণতান্ত্রিকদের মাঝে প্রকারভেদ আছে। তিনি কনজারভেটিভ বা রক্ষণশীল গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন ইসলামের সাথে আক্বিদাগত সাংঘর্ষিক জায়গাগুলোতে ব্যাখ্যায় যাওয়া এবং ইসলামের সাথে সংঘর্ষ দূর করার চেষ্টা করা। তাঁর এই প্রকারভেদটা আমার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়েছে। আসলে গণতন্ত্রের ইসলামী ব্যাখ্যা গণতন্ত্র করে না, বরং গণতান্ত্রিকরা করে। তাই, এখানে গণতন্ত্রকে প্রকারভেদ করার দ্বারা একটি অঞ্চলের গণতন্ত্রে অংশগ্রহণকারী স্বঘোষিত সেক্যুলারদেরও এই প্রকারভেদে ফেলা হয়। যাইহোক, গণতন্ত্রকে দুইভাগ না করে গণতান্ত্রিকদের প্রকারভেদ করাই সঙ্গত মনে হয়েছে আমার দৃষ্টিতে! আর, ঐ ভাইয়ের বলা তাওহিদ ও জিহাদের নববী মানহাজের অনুসরণকারী ভাইয়েরাও মূলত গণতান্ত্রিকদের মাঝে প্রকারভেদ করে থাকেন, গণতন্ত্রের মাঝে না। অর্থাৎ, এখানে মূল বিষয়টা হলো ঐ ভাইয়ের করা গণতন্ত্রের প্রকারভেদে কোন মৌলিক প্রায়োগিক পার্থক্য নেই। পার্থক্য হল ব্যাখ্যায়। এটা একটা কৃত্রিম পার্থক্য। এটার অস্তিত্ব হল ব্যাখ্যাদানকারীদের মনোজগতে। বাস্তবতা হলো উভয় প্রকারের ধরণ একই – সংসদ আইন পাশ করবে, সেই আইন দিয়ে বিচার হবে। শাসন হবে। বাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনমত ও সেই অঞ্চলের অবস্থা বিবেচনায় কিছু ছোট-খাটো বাহ্যিক পরিবর্তন থাকে। যেমন- সংবিধানে বিসমিল্লাহ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উল্লেখ থাকা!

যাইহোক, ঐ ভাইয়ের আলোচনার উপর আমার পর্যালোচনার মূল বিষয় এটা না। মূল আলোচ্য বিষয় হলো তাঁর শেষের কিছু কথা নিয়ে, যেখানে তিনি ভোটে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

''যতদিন নিরেট ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, ততদিন প্যারালাল বা বিকল্প পন্থায় ইসলামকে শক্তিশালী করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভোটে কিছু ভাল মানুষ ও আলেমের অংশগ্রহণ জরুরী। এর মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার নিয়তে নয়, এবং এটাকে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে নয় বরং এই কঠিন পরিস্থিতিতে সরকারে অবস্থানের মাধ্যমে যতটা ইসলমাবিরোধিতাকে দমিয়ে রাখা যায় এই উদ্দেশ্যে ভোটের রাজনীতিতে অংশ নেওয়া জরুরী। এবং বিচক্ষণ আলেমরা মূলত এই নিয়তেই অংশ নেন। এই অংশ নেওয়া ইসলামের জিহাদ ও বিপ্লবের এন্টি হিসেবে নয়, বরং তার কাজকে সহজায়ন ও সহযোগিতার জন্য।''

আমি তাঁর এই আলোচনার সাথে একমত হতে পারলাম না! আর, বাস্তবতাও তাঁর কথার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখতে পাচ্ছি! বাস্তবতা হলো-

১। তাঁরা কোন বাঁধা দিতে পারেন না । বাঁধা দেয়ার অর্থ হল, কোন আইন বা পলিসি পাশ করতে যাওয়া হচ্ছে সেটাকে থামিয়ে দেয়া। শুধু বিরোধিতা করা না। ইসলামপন্থীদের যে অবস্থা তাতে তারা সংসদে এমন শক্তিশালী বিরোধিতাও তৈরি করতে পারে না। আর যেসব দেশে ইসলামী সেন্টিমেন্টের কথা সংসদ আমলে নেয়, সেসব দেশে আমলে নেয়ার কারণ সংসদে বা শাসন ক্ষমতায় ইসলামপন্থীদের অবস্থান না, বরং দেশের মানুষের মধ্যে ইসলামী চেতনা। যেমন:- পাকিস্তান বা সৌদি আরব। আর এসব দেশে শক্তিশালী ইসলামী চেতনার কারণ হল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আলেম উলামার দৃঢ় দাওয়াহ ও সোচ্চার অবস্থান।

২) যাঁরা ইসলামী গণতন্ত্র করেন – তাঁরা নিজেরাই এটাকে জিহাদের বিকল্প হিসাবে দাড় করান। যেমন-বাংলাদেশের চরমোনাই, জামাআতে ইসলামী, মিশরের ইখওয়ান; তাঁরা নিজেরাই বলেন- এটাই হল জিহাদ। বরং তাঁরা তো আসল জিহাদকে অস্বীকার করে এটাকেই জিহাদ বলে চালিয়ে দিচ্ছেন! সুতরাং, বাস্তবতা বিবর্জিত ব্যাখ্যা মাথা থেকে বের করে এনে দিলে হবে না, সেটা বাস্তবতার সাথে মিলতে হবে।

৩) এই ইসলামপন্থিদের অনেকেই প্রায় সময় মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।

৪) এই ইসলামী গণতান্ত্রিকরা বলেন- আমরাও স্বীকার করি যে, পূর্ণাঙ্গ শরীয়াহই হলো উত্তম কিন্তু না পারাতে আমরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। অথচ, যখন কেউ পূর্ণাঙ্গ শরীয়াহ অনুযায়ী কোন কাজ করে, তখন এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে সেই উত্তম কাজটা দমনে এই ইসলামপন্থিদের কাজ করতে বাধ্য হতে হয়। এটার অনেক প্রমাণ আছে, আর আমীন শাহিনের ঘটনা একটা প্রমাণ। এটা হল এমন ব্যাপার যে, আমি ফিরাউনের বাহিনীতে ঢুকে বনি ইসরাঈলের জন্য কিছু অর্জন করতে পারি কি না দেখি। কিন্তু চাইলেও অনেক সময় আমি ভালোটা করতে পারি না, আমাকে আল্লাহর হুকুমের বদলে ফিরাউনের হুকুমই মানতে হয়।

এই হলো ইসলামপন্থীদের গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের বাস্তবতা। এই বাস্তবতা ঐ ভাইয়ের *''উলামায়ে কেরাম ও ভালো মানুষের প্রচলিত গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া*

ইসলামের জিহাদ ও বিপ্লবের এন্টি হিসেবে নয়, বরং তার কাজকে সহজায়ন ও সহযোগিতার জন্য! '' এই কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ, উলামায়ে কেরাম ও ভালো মানুষের প্রচলিত গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া ইসলামের জিহাদ ও বিপ্লবের পথে অন্তরায়! এর কিছু কারণ আছে, যা আমার পূর্বোক্ত আলোচনায় মোটামুটি এসে গেছে। তারপরও, সেই কারণগুলো নির্দিষ্টভাবে আমি ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ-এর কথা থেকে দিচ্ছি-

ইবনুল জাওযী (মৃত্যু; ৫৯৭ হিজরি) (রহিমাহুল্লাহ) তার 'তালবিসুল ইবলিস' বইতে (পৃষ্ঠা ১২১-১২২) বলেছেন- *"উলামাগণ যখন শাসকদের সাথে মেশা শুরু করেন ইবলিস তখন তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। এই ধোঁকার ফলে আলেমগণ শাসকদের তোষামোদ করা শুরু করেন এবং সুযোগ থাকা স্বত্বেও তাদেরকে অন্যায় কাজে বাধা প্রদান থেকে বিরত থাকেন। তারা শাসকদের সে সকল ক্ষেত্রেও ছাড় দেয়া শুরু করেন যেখানে ইসলাম কোন ছাড় দেয়না এর ফলে তারা দুনিয়াবি কিছু স্বার্থ হাসিল করতে পারেন। আর এভেবেই অন্যায় ও দুর্নীতির রাস্তা তারা খুলে দেন।*

প্রথমত, শাসকরা বলে থাকে- আমি যদি সঠিক না হতাম তাহলে এই সকল আলেমরা অবশ্যই আমাকে বাধা প্রধান করতেন। আর যেহেতু তারা আমার দেয়া সম্পদ-হাদিয়া গ্রহণ করছেন সেহেতু অবশ্যই আমার সম্পদ-হাদিয়া হালাল।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ জনগণ বলে থাকে- এই শাসকের শাসন ব্যবস্থা, তার সম্পত্তি, তার কাজ কর্ম সবকিছুই ঠিক আছে। যদি ঠিক না থাকতো তাহলে অবশ্যই উলামাগণ তার সম্পর্কে সমালোচনা করতেন।

তৃতীয়ত, আলেমগণ বলে থাকেন- যেহেতু তারা তাদের দ্বীনকে কলুষিত করেছেন তাই শয়তান ইবলিস তাদের দ্বারা শাসকের উক্তির স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করায়। তারা বলে থাকেন আমরা শাসক ও সাধারণ মুসলিমদের মাঝে মধ্যস্থতা করার জন্য শাসকদের কাছে গিয়ে থাকি। তবে তাদের এই মিথ্যা ধোঁকা প্রকাশিত হয়ে যায় যখন অন্য কেউ শাসক ও মুসলিমদের মাঝে মধ্যস্থতা করার জন্য এগিয়ে আসে। তারা এই নতুন আগুন্তককে নিয়ে খুশি হয় না। তারা শাসকের কাছে নতুন আগুন্তককে নিয়ে আজে বাজে কথা বলে থাকে কারণ তারা শাসকদের একমাত্র মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকতে চায়।

তাই শাসকদের সাথে থাকা ঈমানদারদের জন্য খুব বিপদজনক। যখন আলেম উলামারা শাসকদের দরবারে যান তখন হয়ত সঠিক নিয়তেই যান, কিন্তু যখন শাসক তাদেরকে সম্মান করা শুরু করেন ও তাদের উপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া শুরু করেন তখন তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা চলে আসে। এরফলে তারা শাসকদের তোষামোদি করা শুরু করেন ও তাদেরকে তাদের অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। আর এভাবেই তাদের নিয়তের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। সুফিয়ান সাওরি বলতেন- "শাসকরা আমাকে অপমান করবে বা ছোট করে দেখবে এটাতে আমি ভয় পাই না। আমি ভয় পাই যে তারা আমাকে সম্মান করবে যার ফলে আমার অন্তর তাদের দিকে ঝুকে পড়বে ''

আলোচ্য বিষয়টিতে শাসক সম্পর্কে বলা আছে,আপনারা শাসকের জায়গায় গণতন্ত্র বসিয়ে একটু মিলিয়ে শুদ্ধ করে পড়ে নেন! তাহলেই আশা করি, উলামায়ে কেরাম ও ভালো মানুষের গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ যে কতটা ক্ষতিকর তা সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে মুফতি হামিদুল্লাহ জান (রহিমাহুল্লাহ)-এর আলোচনাকে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বলেন- হারামকে হালাল সাব্যস্ত করে দেওয়া এবং হালালকে হারাম সাব্যস্ত করা, শরীয়ত প্রণয়নের হক, আইন প্রণয়ন, আইন তৈরির হক কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত।

إن الحكم إلا لله

বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। (সূরা ইউসুফ, ৪০)

কেউ বলবে ভোট আমানত, কেউ বলবে ভোট ওয়াকালত বা প্রতিনিধিত্ব। কেউ বলবে ভোট হচ্ছে সাক্ষ্য। ভোট যা কিছুই হোক, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি — সাক্ষ্য দেওয়া হবে হকের ব্যাপারে। যে বাতিল শাসনব্যবস্থা রয়েছে, তার সমর্থনে ভোট দেওয়া হল সেই বাতিল নেজামকে মেনে নেওয়া, এই বলা যে এই বাতিল শাসনব্যবস্থা সঠিক! আপনি (ভোটকে) শাহাদাত বলছেন! তো আমি শাহাদাত মানছি, আপনি ওয়াকালত বলছেন! তো আমি ওয়াকালত মানছি, আপনি আমানত বলছেন! তো আমি আমানতও মেনে নিচ্ছি। আপনি যাই বলতে চান বলুন! কিন্তু আপনি এটা বলুন যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, এই নাপাক

শাসনব্যবস্থা, ইংরেজদের দেওয়া শাসনব্যবস্থা! এটাকে কার্যকরভাবে মেনে নিবেন কি, নিবেন না?

আমার মুহতারাম বুজুর্গ ভাই! কোরআন আইন প্রণয়ন ও বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দিয়েছে। মুসাল্লামুস সুবুত" এর ইবারত হচ্ছে-

أجمعت الأمة على أن الحاكم هو الله تعالى

উম্মাহ একমত হয়েছে যে, একমাত্র শাসক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।

মুজতাহিদও আইন প্রণয়নকারী নন। তিনি হচ্ছেন শরঈ বিধিবিধানের ব্যাপারে পারদর্শী। তিনি শুধু বলে দেন, প্রণয়ন করেন না। আমরা বুজুর্গদের প্রতি সালাম পেশ করছি, আমরা বুজুর্গদের ইহতিরাম ও সম্মান করি। আমরা বুজুর্গদের প্রতি মন্দ ধারনা করি না। কিন্তু বুজুর্গদের এটাকে কিছু মৌলিক, কিছু অপরাগতা অথবা জরুরত বা ইজতিহাদি ভুল মনে করুন! যিনি যেই ব্যাখ্যা করুক, তিনি অংশ নিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা এটাই প্রমান করে দেয় যে, এই হযরতদের এই প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক পন্থায় কামিয়াব হতে পারবে না। সুতরাং

لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين

একজন মুমিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয়না।

পঞ্চাশ সালের চাইতে বেশি আমরা লোকদের কাছে ভোট চেয়েছি। লোকেরা আমাদের ভোট দিয়েছেন, কখনো এমনও হয়েছে যে, আমাদের ৮৫ মেম্বার (সংসদ সদস্য) অর্জন হয়েছে। জাতীয় এসেম্বলিতে যথেষ্ট আধিক্য অর্জন হয়েছে। কিন্তু আপনারা দেখেছেন — কোন ইসলামী বিধানটা এসেছে? তারা বলে যে, আমরা (ভোট/নির্বাচনের মাধ্যমে) প্রতিরক্ষা করছি, প্রতিরক্ষা কাকে বলে? নারী অধিকার বিল পাস হয়েছে। কেউ এটাকে প্রতিহত করতে পেরেছে? জবাব দিন! বলুন!

আমি আরজ করবো, আল্লাহর ওয়াস্তে আগে বাস্তবতা বুঝুন! হে মৌলবিরা! তাওবা করুন! আমি বলছি, আমি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশ নিয়েছি। ৭০ সালে আমি মেম্বার (সংসদ সদস্য) ছিলাম। মাওলানা সদর শহীদও পাস হয়েছিলেন। ৬০ হাজারের ভোটের লিড পেয়ে পাস হয়েছেন। কিন্তু আমি পরিস্কার

ভাষায় বলছি- আমি এই গুনাহ থেকে তাওবা করে নিয়েছি। আল্লাহ আমার তাওবা কবুল করুন! আপনাদের কাছে দরখাস্ত করছি, আপনারাও তাওবা করুন! আসুন! খেলাফত শাসনব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের মূল ভিত্তি অনুসারে ময়দানে আসুন! কেন ঘাবড়াচ্ছেন? আসুন ময়দানে আসুন! দেখুন ইসলামী শাসনব্যবস্থা আসে কিনা! তো আমি কেবল এটাই দরখাস্ত করবো এবং পাকিস্তান ইসলামী হবে কিন্তু কবে? যখন আপনারা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ছুটি দিয়ে দিবেন। এবং এই নাপাক, এই মরা কুকুর আপনাদের কুপ থেকে তুলে ফেলতে হবে, তারপরেই আপনাদের পাক পানি ব্যবস্থা হবে।" ভিডিও লিঙ্ক —

https://youtu.be/Mx৭E_২t৪Qzg

সবশেষে, এই ভাইসহ অন্যান্য ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলবো – যেহেতু তারা নিজেরাই স্বীকার করছেন যে সেক্যুলার গণতন্ত্র কুফর এবং তাদের কৃত্রিম ব্যাখ্যাজাত দ্বিতীয় প্রকারের গণতন্ত্র, অর্থাৎ রক্ষনশীল গণতন্ত্রও 'আসলে ইসলামসম্মত না' এবং 'দ্বিতীয় প্রকারটি মেনে নেওয়া এবং গ্রহণ করা ইসলামী গায়রত ও আত্মমর্যাদাবিরোধী''' আর যেহেতু তারা বলছেন যেসব আলেমরা গণতন্ত্রে অংশ নেন তাদের উদ্দেশ্য হল "ইসলামের জিহাদ ও বিপ্লবের এন্টি হিসেবে নয়, বরং তার কাজকে সহজায়ন ও সহযোগিতার জন্য" ; তাই আপনাদের প্রতি মুসলিম ভাই হিসাবে আমাদের নসীহত হল, এই বাস্তবতা স্বীকার করা যে বর্তমানে এই ভূখণ্ডসহ পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম 'সেক্যুলার গণতন্ত্র' কুফর হবার ব্যাপারে এবং গণতন্ত্রের ইসলামবিরোধী হবার ব্যাপারে অবগত নয়। আর, বর্তমানে এ ভূখণ্ডসহ পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম ফরয জিহাদের ব্যাপারে অজ্ঞ, উদাসীন কিংবা বিভ্রান্ত। অতএব, যদি কেউ জিহাদের সহজায়ন এবং সহযোগিতা করতে চানই, তবে তার উচিৎ আগে এ দুটি বিষয় (গণতন্ত্র ও জিহাদ)-এর ব্যাপারে মানুষের সামনে সত্য স্পষ্ট করা। এই সত্যের দাওয়াহকে ব্যাপক করা, একে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া। গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব না, বরং জিহাদের মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম হবে, এই সত্য সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা এবং এ সংক্রান্ত ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করা। দুঃখজনক বিষয় হল আমরা উক্ত ভাই ও তার মতো অন্যান্যদের মাঝে তাদের কথার প্রতিফলন দেখতে

পাই না। যে পরিমাণ সময় তারা মুজাহিদিন, মুজাহিদিন উলামা, উমারাহ এবং মুজাহিদিনের সমর্থকদের খণ্ডনে ব্যয় করেন তার ১০ শতাংশ সময়ও তারা ব্যাপকভাবে প্রচলিত এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য দেন না।

আমরা দুয়া করি মহান আল্লাহ্ তায়ালা যেন তাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দেন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যার ফাঁদে পড়ে গণতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি ও মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া থেকে হেফাজত করেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৫১০

আত্মঘাতী হামলা কি বৈধ?

আবু বকর সিদ্দিক

Junior Member

১১-২৬-২০১৮

প্রশ্নঃ একটি মাসিক পত্রিকায় জানুয়ারী '০৪ সংখ্যায় 'সাওয়াল- জওয়াব' শীর্ষক শিরোনামে 'আত্মঘাতী বোমায় নিহত ব্যক্তির হুকুম প্রসঙ্গে' রাফিয়া খাতুন, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, প্রশ্ন করেন-

"আমরা জানি, আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। কিন্তু বর্তমানে অনেক দেশে মুজাহিদগণ ইহুদী, খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজের দেহে বোমা স্থাপন করে নিজেকে মানব বোমায় পরিণত করে মার যাচ্ছেন। এরুপ আত্মঘাতী বোমা হামলা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি? আত্মঘাতী বোমায় নিহত ব্যক্তিটি কি আত্মহত্যাকারী গণ্য হবে ?"

জবাব দেয়া হয়েছে, " না, এরুপ আত্মঘাতী বোমায় প্রাণ উৎসর্গ শরীয়তে জায়েয নয়। তা সম্পূর্ণ হারাম। আত্মঘাতী বোমায় নিহত ব্যক্তি অবশ্যই আত্মহত্যাকারী গণ্য হবে।

প্রশ্ন হলো, উক্ত মাসিকের এই জবাব কি সঠিক ? শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা আর আত্মহত্যা কি এক ?

যারা ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে অত্যাচারী কাফের, মুশরিক, ইহুদীদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলার পথ নিচ্ছে, তারা কি আসলেই জাহান্নামের পথে পা বাড়াচ্ছে? এ ব্যাপারে মাননীয় মুফতী সাহেবের মূল্যায়ন কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তরঃ 'আত্মহত্যা 'আর 'আত্মঘাতী হামলা 'এদু'টি বিষয় শাব্দিকভাবে যেমন দু'রকম, তেমনি অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। দু'টির শরঈ হুকুমও বিপরীতমুখী।

আত্মহত্যা হলো, জীবনের উপর অতিষ্ঠ হয়ে (অথবা কোন কারণ ছাড়াই) উদ্দেশ্যহীনভাবে নিজের জন্য মৃত্যুকে বেছে নেয়া।

পক্ষান্তরে ‘ আত্মঘাতী হামলা ‘ হচ্ছে শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করার এমন একটি কৌশল, যা অবলম্বন করলে হামলাকারীর জীবনও হুমকীর মুখে পতিত হয় এবং তার মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রথমেই জেনে রাখা ভালো যে, আত্মঘাতী (আত্মোৎসর্গ) বোমা হামলার বিষয়টি নতুন হলেও আত্মঘাতী (আত্মোৎসর্গ) হামলার কৌশল কিন্তু নতুন নয়। বরং ইসলামের শুরুর যুগেও এর নযির রয়েছে।

কুরআনুল কারীমের নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ, এ বিষয়ের হাদীস এবং ফিকহ ও ফাতাওয়া গ্রন্থগুলোর সংশ্লিষ্ট অংশ যারা গভীরভাবে অধ্যায়ন করেছেন, তাদের ভালোভাবই জানা থাকবে যে,

ইসলামের শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করা, শত্রু শিবিরে আতংক সৃষ্টি করা অথবা অন্য কোনভাবে মুসলমানদের বিশেষ উপকার সাধনের লক্ষে মৃত্যু অনীবার্য জেনেও এককভাবে শত্রুর উপর হামলা করে স্বীয় জীবন বিসর্জন দেয়া শুধু জায়েযই নয় বরং বিরাট ফজিলত ও সওয়াবের কাজও বটে।

এ বিষয়ের দলিল থেকে কয়েকটি পেশ করা হচ্ছে –

সূরা বাকারার ১৯৫ নং আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (র) সাহাবী হযরত হুযাইফা (রাঃ) এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন-

তিনি বলেছেন, আয়াতটি সদকার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, আল ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবীব আসলামের মাধ্যমে আবু ইমরান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা কুসতুনতানিয়ার (ইস্তাম্বুল) যুদ্ধে ছিলাম। আবদুর রহমান ইবনুল ওয়ালীদ দলের আমীর ছিলেন। রোম সেনাদল (শত্রু পক্ষ) শহরের দেয়ালকে পিছনে রেখে প্রস্তুত ছিলো।

এরই মধ্যে একজন মুসলমান শত্রুপক্ষের উপর একা অতর্কিত হামলা করে বসলো। তা দেখে কিছু লোক বলে উঠলো, হায় হায় ! লোকটি কি করলো ? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! নিজেকে ধ্বংসে পতিত করলো (অর্থাৎ আত্মহত্যা করলো)? তখন সাহাবী হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, সুবাহানাল্লাহ ! ... (তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত করো না)। এ আয়াতটি আমাদের আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

(তিনি বলেন,) ধ্বংসের মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করার মানে হলো, ধন-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা ও জিহাদ না করা। (তাফসীরুল কুরতুবী – ২/ ৩৬১)

উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। এ রেওয়ায়েতে একজন মুজাহিদের একটি শত্রুপক্ষের ভিতর হামলা করতে যাওয়াকে যেখানে তার কিছু সহযোদ্ধা আত্মঘাতী হামলা মনে করে চিন্তিত হয়েছেন, তার জবাবে প্রখ্যাত সাহাবী আবু আইউব আনসারী সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, এটিও জিহাদের অংশ।

ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আনাস ইবনে মালেকের (রাঃ) ভাই বারা ইবনে মালেক (রাঃ) তাঁর সহযোদ্ধাদের বললেন, আমাকে তোমরা চামড়ার থলেতে ঢুকিয়ে শত্রু দলের ভিতরে ফেলে আসো, তারা তাই করলো। হযরত বার একাই তাদের সাথে লড়াই করলেন এবং দূর্গের গেট খুলে দিলেন। (তারীখে তাবারী ও তাফসীরে কুরতুবী – ২ /৩৬৪)

তাফসীরে কুরতুবীতে এই মাসআলাটি এভাবে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি নিশ্চিত হয় যে, শত্রু পক্ষের উপর হামলা করতে গেলে সে নিহত হবে, কিন্তু এর দ্বারা শত্রু ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা তাদের মধ্যে এমন প্রভাব পড়বে, যার দ্বারা মুসলমানগণ উপকৃত হবে- একথা ভেবে যদি সে দুশমনের দলের ভিতর একাই হামলা করে বসে, তবুও তা জায়েয।

(ইমাম কুরতুবী এ বক্তব্যের দলীল স্বরুপ বলেন) বর্ণিত আছে যে,

“এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় সওয়াবের উদ্দেশ্যে সবর করে নিহত হই, তবে আমার হুকুম কি হবে ?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাবে বললেন, ‘ এর বিনিময়ে তুমি জান্নাত পাবে। ‘এ কথা শুনে লোকটি শত্রুদলের ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।” (তাফসীরুল কুরতুবী – ২ /৩৬৪)

ইমাম আবু হানিফার প্রখ্যাত শাগরেদ, হানাফী মাযহাবের মৌলিক ছয়টি কিতাবের রচয়িতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) তাঁর কিতাব আস-সিয়ারুল কাবীরে

এ ধরনের হামলার সুস্পষ্ট অনুমোদন দিয়েছেন। (আহকামুল কোরআন, ১১/ ২৯০)

“উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস সুবিখ্যাত হাদীস ভাষা ই’লাউসুনানের রচয়িতা আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) তাঁর কিতাবে (আহকামুল কোরআন) বহু আয়াত, হাদীস এবং ইমামদের বক্তব্য উল্লেখ করে এ ধরনের হামলা (মুসলমানদের উপকারের স্বার্থে আত্মঘাতী হামলা) কে শুধু জায়েযই বলেননি বরং হামলাকারী শাহাদাতের সুউচ্চ মরতবা পাবেন এ কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন”

(দ্রষ্টব্যঃ আহকামুল কোরআন – ১১ / ২৯০- ২৯২)

প্রশ্নোত্তরের এ সংক্ষিপ্ত কলেবরে এর চেয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা’য়ালা সকলকে সহীহ দ্বীন বুঝার ও বলার তাওফীক দিন।

জাযাকাল্লাহু খাইরান।

উত্তর প্রদানঃ

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,

মুহতামিম,
মারকাজুদ্ দাওয়াতিল ইসলামিয়া (উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান)
ঢাকা, বাংলাদেশ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৬২৪

দারুল ইসলাম এবং দারুল হারব

আবু বকর সিদ্দিক

Junior Member

12-02-2018

দারুল ইসলামের সংজ্ঞা ও পরিচয়

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, "দারুল ইসলাম— এমন ভূমি, যা মুসলমানদের শাসনাধীন। যেখানে ইসলামের আহকাম ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে। (হাকিম শহিদ রহ. 'আলকাফি' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে এই সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।) যেই ভূমিরা অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান, কিংবা সকলেই ইসলামের শাসনব্যবস্থা মান্যকারী অমুসলিম (যিম্মি) কিংবা উভয় গোষ্ঠীরই উপস্থিতি— সমান; সর্বাবস্থায়ই তা দারুল ইসলাম।

ইসলাম আসার আগে তো আর দারুল ইসলাম বলতে কিছু ছিলো না। সব ছিলো দারুল হারব। তো এই দারুল হারব কীভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়— আসুন, সে বিষয়টা জেনে নেই। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর 'আসসিয়ারুল কাবির' এবং সারাখসি রহ. প্রণীত তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোকে প্রতিভাত হয়— দারুল হারব তিনভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়।

১. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের শহরেই অবস্থান করে, তবে তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। [শরহুস সিয়ারিল কাবির, সারাখসি— ১/২৪৯-২৫০]

তেমনি যদি মুশরিকরা তা বিজয় করে নেয় এরপর মুসলমানরা পুনরায় তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, এবং মুশরিকরাও সেখান থেকে বিতাড়িত হয়, আর মুসলমানরাও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তবে তা দারুল ইসলাম হিসেবেই পরিগণিত হবে। কেননা যখন মুশরিকরা তার কবজা নিয়ে নিয়েছিলো, তখন তা দারুল হারব হয়ে গিয়েছিলো। এরপর যখন মুসলমানরা তা বিজয় করে

নিলো এবং সেখানে বসবাসের সংকল্প করলো, তখন পুনরায় তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছে। [প্রাগুক্ত; আলআহকামুস সুলতানিয়া, মাওয়ারদি— ১৩৭]

২. দারুল হারবের কোনো ভূমি বিজয় এবং তার ওপর ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়নের ঘোষণার মাধ্যমেও দেশ দারুল ইসলাম হয়। সারাখসি রহ. বলেন, "মুসলমানরা যদি শত্রুদের কোনো ভূমি বিজয় করে এবং তাদের পূর্ণ দখলে আসে, হারবি অধিবাসীরা পলায়ন করে, তবে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে।"

আল্লামা হাসকাফি রহ. বলেন, "এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, ইসলামের কিছু আহকাম-বিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।''[আদদুররুল মুনতাকা শরহুল মুলতাকা— ১/৬৩৮]

বোঝা গেলো, ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধু দেশ বিজয়ের দ্বারাই তা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না। তেমনি হারবিরা পূর্ণরূপে বিতাড়িত না হলে, তাদের ক্ষমতা-প্রতাপ পরিপূর্ণ বিদূরিত না হলে তা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা ইসলামি ভূমি হওয়ার জন্য প্রথমে কুফরের মূলোৎপাটন জরুরি। [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৩/১০০৪-১০০৬, ৪/১২৫৩, ১২৫৭; আলমাবসুত— ১০/২৩, ১১৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া— ২/২৩২; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া (হিন্দিয়ার ষষ্ঠ খণ্ডের টীকায়)— ৩/৩১১-৩১২]

সারাখসি রহ. এর কথায় ফিরে যাই। এরপর তিনি বলছেন, "মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশ দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। মুশরিকদের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তারা 'যিম্মি' বলে গণ্য হবে।" (আর হারবি থাকবে না।)। [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/২১৬, ২১৯১, ২১৯৭; আলমাবসুত— ১০/২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া— ২/২৩২; আদদুররুল মুখতার— ৪/১৭৫; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; রাওযাতুত তালিবিন— ৫/৪৩৩; তুহফাতুল মুহতাজ— ৯/২৬৯]

বোঝা গেলো, কোনো দেশ দারুল ইসলাম হতে পারে; যদিও তার সকল নাগরিক অমুসলিম হয়। কেননা তাতে ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নাগরিকরা অমুসলিম হলেও রাষ্ট্র ইসলামি শাসনক্ষমতার অধীন রয়েছে। তেমনই কোনো দেশ

দারুল হারব হতে পারে; যদিও তার অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম হয়। কেননা তাতে কুফরের শাসন ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নাগরিকরা মুসলিম হলেও রাষ্ট্র কুফরি শাসনক্ষমতার অধীন রয়েছে।

এজন্যই ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, "যদি মুসলমানদের কোনো সৈন্যদল দারুল হারবে প্রবেশ করে এবং খলিফার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোনো আমিরের তত্ত্বাবধানে তারা থাকে, তখন তারা দারুল হারবের কোনো শহরে ঢুকে তাদের সামনে ইসলাম উপস্থাপন করে, আর তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন মুসলিম সৈন্যদল তাদেরকে জিযয়া প্রদান করতে নির্দেশ দেয়, আর তারাও এ আহ্বান মেনে নেয়...এবং তারা বলে, তোমরা আমাদেরকে এই 'আহদ' দাও যে, আমরা স্থায়ীভাবে এই ভূমিতেই থাকবো। এরপর যতোক্ষণ মুসলমানরা তাদের সঙ্গে বাস করবে, তারা হারবিদের ওপর শক্তিশালী এবং হারবিরাও তাদের থেকে নিবৃত্ত থাকবে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই যে, আমির তাদেরকে 'যিম্মি' বানিয়ে নিবে এবং তাদের ওপর একজন আমির নির্ধারণ করে দিবে, যিনি তাদের ওপর ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাদের ওপর ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারাই তারা 'যিম্মি' এবং দেশ দারুল ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত হবে।...যদি মুসলমানরা যিম্মিদের সহযোগিতা ছাড়া ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হয়, তবে আমির তাদের 'যিম্মা' চুক্তি গ্রহণ করবেন না। কেননা যখন যিম্মিদের সাহায্য-সন্তুষ্টি ছাড়া মুসলমানরা ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হবে, তখন আদতে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করছে যিম্মিরা; (মুসলমানরা নয়) অথচ ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করবে একমাত্র মুসলিমরা।" [আসসিয়ারুল কাবির মা'আ শরহিস সারাখসি— ৫/২১৯১-২১৯৩; মাজমাউল আনহুর— ১/৬৫৯; আহকামুদ দিয়ার— ১৮-২০;]

এর আলোকে বলা যায়, যেসব দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা নেই, যদিও তাতে মুসলমানরা ওয়াজ-মাহফিল, ইদ-জামাআত ইত্যাদি আদায় করতে পারে, তা দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে না। [মাজাল্লাতুল কানুন ওয়াল ইকতিছাদ, যিলহজ সংখ্যা, ১৩৫৪ হিজরি, পৃ. ২০৩, তা'লিক- ১]

৩. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, যদি যিম্মিরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে পরাজিত করে দারুল ইসলামের দখল নিয়ে

নেয়, তবে তাদের শাসন চলতে পারে, যদি মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে সেখানে বাস করতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে তা দারুল হারব হয়ে যায়নি। দেখছো না, মুসলমানরা সেখানে নিরাপদ! এটা আদতে দারুল ইসলামই, যদিও আজ তার এই অবস্থা। [কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়, ইমাম মুহাম্মাদ— ২১৭]

আল্লামা সারাখসি রহ. বলছেন, যেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে বাস করতে পারে না, তা দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা দারুল ইসলাম সেই ভূখণ্ড, যা মুসলমানদের হাতে রয়েছে। আর এর বাহ্যিক আলামাতই হলো মুসলমানদের যথাযোগ্য নিরাপত্তা। [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১২৫৩; আলমাবসুত— ১০/৯৩, ১১৪]

হাকিম শহিদ রহ. বলেন, "দারুল ইসলাম তা, যাতে মুসলমানদের শাসকের ক্ষমতা চলে।"

দারুল ইসলাম সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন— বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৪; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; কাশশাফ— ২/২৫৬; আলকুল্লিয়্যাত, কাফাবি— ২/৩৪১; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ২/১৫৩; উসুলুদ দীন— ২৭০; নিহায়াতুল মুহতাজ— ৮/৮২; আসনাল মাতালিব— ৪/২০৪; আলমু'তামাদ ফি উসুলিদ দীন— ২৭৬; আহকামু আহলিয যিম্মাহ— ১/৫; আততাশরিউল জিনায়ি— ১/২৭৫-২৭৬]

দারুল হারবের পরিচয়

দারুল হারব— মানে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্র নয়। অনেকে ভাবেন, দারুল হারব শুধু এমন রাষ্ট্রকেই বলা হয়, যা কোনো মুসলিম ভূখণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। বাস্তবে বিষয়টা এমন নয়। কোনো ভূখণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হয় আর কোথাও কুফরি এবং শিরকি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল হারব বলা হয়। দারুল হারবকে অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক ইত্যাদিও বলা হয়। এসব পরিভাষার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। ফকিহগণ দারুল হারবের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। এজন্যই সারাখসি রহ. বলেন, "দারকে আমাদের দিকে বা তাদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে।'' [আলমাবসুত, সারাখসি— ১০/১১৪]

এ বিষয়টাকেই আল্লামা কাসানি রহ. আরো বিস্তারিত করে এভাবে বলেছেন, "কোনো রাষ্ট্রে কুফরের আহকাম-বিধিবিধান প্রকাশিত হলে তা দারুল কুফর হয়ে যায়। ... রাষ্ট্র শুধু কুফরের বিধানাবলী প্রকাশিত হওয়ার দ্বারাই দারুল কুফর বলে গণ্য হয়।" [বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫; আরো দেখুন— আহকামুদ দিয়ার, আবিদ সুফয়ানি— ১৫]

বোঝা গেলো, কোনো রাষ্ট্র দারুল হারব (অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক) হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লড়াই-যুদ্ধ চলমান থাকা অপরিহার্য নয়। এজন্যই হাম্বলি ফকিহগণ বলেন, "হারবি শব্দটা হারবের দিকে সম্পর্কিত। হারব অর্থ— কিতাল (লড়াই), তেমনি এর অর্থ দূরত্ব এবং বিদ্বেষও। তো দারুল হারব অর্থ হলো এমন রাষ্ট্র, যার সাথে মুসলমানদের দূরত্ব কিংবা মুসলমানদের প্রতি রয়েছে যার বিদ্বেষ। হারবিকে হারবি এই দ্বিতীয় অর্থ, তথা দূরত্ব এবং বিদ্বেষ— এর বিচারেই বলা হয়। কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা জরুরি নয়। [আলমুতলি' আলা আবওয়াবিল মুকনি', বা'লি— ২২৬]

দারুল হারবের সংজ্ঞা

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, "দারুল হারব এমন ভূখণ্ড, যেখানে শিরকের বিধিবিধান প্রকাশিত এবং যার ওপর হারবিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত।" [আসসিয়ারুল কাবির মা'আ শারহিস সারাখসি— ১/২৫১; ৪/২০৭০, ২১৯৭; আলমাবসুত— ১০/১১৪; বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; মাজমাউল আনহুর— ১/৬৫৯]

এজন্যই তিনি বলেন, "দারুল হারবের কোনো রাষ্ট্রের সাথে যদি মুসলমানরা এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, সেখানে তারা ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করবে না, তবে তা দারুল হারব (-ই থেকে যাবে)।" সারাখসি রহ. এর ইল্লত (কারণ) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, "কেননা কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয় সেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করার দ্বারা। উল্লিখিত ভূখণ্ডে তো মুসলমানদের বিধানাবলী প্রয়োগ করা হয়নি। তাই তা দারুল হারব থাকবে।" তিনি বলেন, "দারুল হারব তা-ই— যেখানে কাফিরদের বিধান চলে।" [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/২১৬৫; আলমাবসুত— ১০/১১৪]

তিনি আরো বলেন, "যে স্থানে মুসলমানরা নিজেদের ব্যাপারে নিরাপদ নয়, তা দারুল হারব। কেননা দারুল ইসলাম তা-ই, যা মুসলমানদের শাসনাধীন। আর এর বাহ্যিক নিদর্শন হচ্ছে, সেখানে মুসলমানরা নিরাপদে বাস করে।" [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১২৫৩]

এজন্যই অনেক হানাফি ফকিহ এভাবে বলেছেন, "দারুল হারব তা, যেখানে কোনো কাফির রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ চলে কিংবা যেখানকার মুসলমানরা কাফিরদের ভয়ে ভীত থাকে।" [আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; কাশশাফুল ইসতিলাহাত— ২/২৫৬; আলকুল্লিয়্যাত— ২/৩৪১]

জমহুর ফকিহগণ দারুল হারবের সংজ্ঞা এভাবেই দিয়েছেন। ইমাম মালিক রহ. বলছেন— "মক্কা সেসময়ে দারুল হারব ছিলো; কেননা সেখানে তখন জাহিলিয়্যাতের বিধান কার্যকর ছিলো।" [আলমুদাওয়ানা, রিওয়ায়াতু সুহনুন— ২/২২]

মালেকি, শাফেয়ি, হাম্বলি— সবার বক্তব্য প্রায় একই ধরনের। [দেখুন— প্রাগুক্ত; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ২/১৫১; ফাতাওয়াশ শায়খ আলিশ— ১/৩৭৭; উসুলুদ দীন, বাগদাদি— ২৭০; আলইকনা' মাআ কাশশাফিল কিনা'— ৩/৩৮; আলমুকনি' মাআল ইনসাফ— ৪/১২১; আলমুবদি'— ৩/৩১৩; আলফুরু'— ৬/১৯৭; আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ— ১/২১৩]

মুতাআখখিরিনদের মধ্যে উস্তাদ আব্দুল কাদির আওদা সুন্দর লিখেছেন, "দারুল হারব প্রত্যেক এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবেশ করেনি, কিংবা যেখানে ইসলামের বিধান প্রকাশিত নয়। এ রাষ্ট্রগুলো একই সরকারের পরিচালনাধীন থাক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন সরকারের— সবই সমান। তার স্থায়ী নাগরিকদের মাঝে মুসলমানরা থাকা বা না থাকা সবই সমান; যতোদিন তারা ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম থাকে।" [আততাশরিউল জিনায়িল ইসলামি— ১/২৭৭]

হারবির পরিচয়

অনেকের ধারণা, হারবি তাকেই বলে, যে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। শব্দ থেকেও অনেকটা এ সংশয় হয়। তবে ফকিহগণের পরিভাষায় হারবি তিন শ্রেণি—

১. যারা বাস্তবে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে যারা পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করার প্রয়াসে সর্বদা তৎপর।

২. যারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে রেখেছে। তাদেরকে হয়রানি করে। জান-মাল-সম্ভ্রম লুট করে। অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে রাখে। কিংবা মুসলমানদেরকে তাদের দীন থেকে ফেরানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত। অথবা যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে।

৩. যারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধেও লিপ্ত নয়, যারা যুদ্ধে লিপ্ত তাদেরও সহযোগী নয়, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনোপ্রকার 'আহদ' নেই।

উপরিউক্ত তিনও শ্রেণিই ফকিহগণের পরিভাষায় হারবি। হারবি হওয়ার জন্য হারবে (যুদ্ধে) লিপ্ত থাকা আবশ্যক নয়। বাদায়িউস সানায়িঃ ৯/৪৩৭৫; আলমিসবাহুল মুনিরঃ ১/১২৭; আদদুররুন নাকি ফি শরহি আলফাযিল খিরাকি, ইবনে আব্দিল হাদিঃ ৩/৭৪৪; আদদুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজওয়িবাতিন নাজদিয়্যাহঃ ৭/৩৯৭; আলইসতিআনা বি গাইরিল মুসলিমিনঃ ১৩২; উসুলুল আলাকাতিদ দুওয়ালিয়্যাহঃ ৩১৩।

দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয়?

ওপরে আমরা আলোচনা করেছি, দারুল হারব কীভাবে দারুল ইসলামে পরিণত হয়। সেখানে আমরা বলে এসেছি, কোনো ভূখণ্ডে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। আর এটাই উম্মাহর সর্বসম্মত মত। [দেখুন— বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৪; আদদুররুল মুনতাকা— ১৬৩৪; আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া— ৩/৩১২; আলফাতয়াল হিন্দিয়া— ২/২৩২]

আজকের এ লেখায় আমরা আলোচনা করবো, দারুল ইসলাম পুনরায় কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয়। তার আগে আমরা জেনে নেই, দারুল ইসলামের ওপর আপতিত অবস্থা মৌলিকভাবে তিন ধরনের।

১. হারবিরা কোনো ইসলামি ভূখণ্ড দখল করে সেখানে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকরা মুরতাদ হয়ে নিজেদের শহরের ওপর দখলারোপ করেছে এবং সেখানে কুফরি শিরকি বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩. ইসলামি রাষ্ট্রের 'যিম্মি'রা তাদের 'যিম্মা চুক্তি' ভঙ্গ করে কোনো দেশ বা শহরের ওপর নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন— কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মাদ, কিতাবুস সিয়ার— ২১৭-২২০; শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/১৯১৪, ১৯৪১; আলজামিউস সগির— ২৪৯; আলমাবসুত— ১০/১১৩-১১৪; বাদাইউস সানায়ি'— ৯/৪৩৭৬; মুখতাসারুত তহাবি— ২৯৪; আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া— ২/২৩২; ফাতাওয়া কাজিখান— ৩/৫৮৪; ফাতাওয়া শামি— ৪/১৭৪; আলবাহরুর রায়িক— ৩/২৩০-২৩১; আলফুরুক, কারাবিসি— ১/৩৪০; আলআহকামুস সুলতানিয়া, মাওয়ারদি— ১৩৮; আলিফসাহ, ইবনে হুবায়রা— ২/২২৯-২৩০; রহমাতুল উম্মাহ, দিমাশকি— ৩৫২]

এবার আমরা উম্মাহর ফকিহগণের বক্তব্য দেখি। তারা এক্ষেত্রে কী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আলোচিত মাসআলায় আমরা উম্মাহর ফকিহগণের দু'ধরনের বক্তব্য পাই। আরো স্পষ্ট করে বললে, আলোচিত মাসআলায় ইমামগণের দু'মাযহাব। প্রথম মাযহাব তিন ইমাম— অর্থাৎ, ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফেয়ি রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এবং সাহেবাইন— অর্থাৎ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর। আর দ্বিতীয় মাযহাব শুধু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর। প্রথমে আমরা সবিস্তারে উভয় মাযহাব উল্লেখ করছি।

প্রথম মাযহাব

প্রথম মাযহাব— কোনো ভূখণ্ড তখন দারুল হারব বলে গণ্য হয়, যখন সেখানে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। চাই তা দারুল হারবের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হোক কিংবা দারুল হারবের সাথে তার প্রতিবেশিত্ব-সংলগ্নতা না থাক, তার মুসলমান কিংবা

যিম্মি নাগরিকরা পূর্বের নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত থাক কিংবা না— সর্বাবস্থায় তা দারুল হারব হিসেবে গণ্য হবে।

বিগত লেখায় আমরা আল্লামা সারাখসি রহ. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি— দারকে মুসলমানদের দিকে অথবা কাফিরদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে। তাই প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে শিরকের বিধান প্রকাশিত, সেখানে শক্তি ও ক্ষমতা মুশরিকদের হাতে। তাই তা দারুল হারব। আর প্রত্যেক এমন স্থান, যেখানে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শক্তি ও ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে। তাই তা দারুল ইসলাম।

[সাহিবাইনের মাযহাব জানার জন্য দেখুন— শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/১৯১৪; কিতাবুল আসল, কিতাবুস সিয়ার— ২১৭; আলমাবসুত— ১০/১১৪; জামিউল ফুসুলাইন— ১/১৩; ফাতাওয়া কাজিখান— ৩/৫৮৪; আলফাতাওয়াল বাযযাযিয়া— ৩/৩১১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া— ২/২৩২; ফাতাওয়া শামি— ৪/১৭৪-১৭৫; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; মুলতাকাল আবহুর— ১/৬৫৯-৬৬০; জামিউর রুমুযের হাওয়ালায় কাশশাফুল ইসতিলাহাত— ২/২৫৬; ফিকহুল মুলুক— ১/৪৬২-৪৬৩]

[অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব জানতে দেখুন— আলমুদাওয়ানা— ২/২২; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ২/১৫১; ফাতাওয়াশ শায়খ আলিশ— ১/৩৭৭; আলমুগনি— ৬/৪০৩-৪০৪; আলইনসাফ— ৪/১২১; কাশশাফুল কিনা'— ৩/৩৮; আলইফসাহ— ২/২৩০; রহমাতুল উম্মাহ— ৩৫২; আহকামুদ দিয়ার, ড. আবিদ সুফয়ানি— ৪৩]

প্রথম মাযহাবের প্রমাণ

১. এই মাসআলাকে মূলত দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার মাসআলার ওপরে কিয়াস করা হয়েছে। (বিস্তারিত জানতে পূর্বের পোস্ট দ্রষ্টব্য)। যেমনিভাবে ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়; যদিও সেখানে কাফিরদের অবস্থান রয়ে যায় এবং তা ইসলামি রাষ্ট্র সংলগ্ন না হয়— অর্থাৎ তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র দারুল ইসলাম না হয়ে অন্য কোনো দারুল হারব হয়, তবুও সবার মতেই তা দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য হয়, তেমনিভাবে দারুল ইসলামেও যখন কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেখানে

মুসলমান থাকলেও এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হলেও তা দারুল হারব হিসেবেই গণ্য হবে। (মুজমা'অ আলাইহি মাসআলার ওপর কিয়াস)। [প্রাগুক্ত]

২. আল্লামা কাসানি রহ. বলেন, "এর ইল্লত হলো, আমাদের দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর বলা— এগুলো তো দারকে (ভূখণ্ড) ইসলাম এবং কুফরের দিকে নিসবত করা। আর দারকে তো ইসলাম এবং কুফরের দিকে নিসবত করা হয়, তাতে ইসলাম কিংবা কুফর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিচারে। যেমন— জান্নাতকে 'দারুস সালাম' নামে নামকরণ করা হয়, তাতে 'সালাম' (শান্তি) থাকার কারণে। তেমনি জাহান্নামকে 'দারুল বাওয়ার' নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু তাতে 'বাওয়ার' (ধ্বংস) রয়েছে। ইসলাম এবং কুফর প্রতিষ্ঠিত হয় তার বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা। যখন কোনো ভূখণ্ডে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা দারুল কুফর হয়ে যায়। তাই এই নিসবত সহিহ। এজন্য ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা লাভের দ্বারাই কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয়; এই একটি মাত্র শর্ত ছাড়া আর কোনো শর্ত নেই। এমনিভাবে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হয়।" [বাদায়িউস সানায়ি'— ৯/৪৩৭৫; আলজারিমাহ ওয়াল উকুবাহ, আবু যুহরা— ৩৪১; ফাতাওয়াল ইমাম রাশিদ রেযা— ১/৩৭৩]

তাতাররা যখন ইসলামি ভূখণ্ডের কিছু দেশ দখল করে নেয়, তখন একদল ফকিহ এর আলোকেই ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. এর বক্তব্য দেখুন—

"তাতারদের ব্যাপক ফেতনার পরে এই যে জায়গাগুলো, যা দখলে নিয়ে তারা সেখানে তাদের বিধিবিধান প্রয়োগ করেছে, যেমন— খুওয়ারিজম, মা ওয়ারাউন নাহর, খোরাসান প্রভৃতি, 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' অনুযায়ী দারুল হারবে পরিণত হয়েছে।" [আলবাহরুর রায়িক— ৩/২৩০-২৩১; হাশিয়াতু তাবয়িনিল হাকায়িক, শিলবি— ৩/২৮৫]

দ্বিতীয় মাযহাব

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যাহিরুর রিওয়াহর অন্যতম কিতাব 'আযযিয়াদাতে' ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. এর অভিমত বর্ণনা করেন—

তিনটি শর্ত সম্মিলিতভাবে পাওয়া গেলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে রূপান্তরিত হবে। শর্ত তিনটি হলো—

১. এসব দেশে প্রচার-প্রসিদ্ধির সাথে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তা এভাবে হবে যে, শাসক কাফিরদের সংবিধান-নীতির আলোকে দেশ শাসন করবে, (ইসলামের নির্দেশনা জেনে বাস্তবায়ন করার জন্য) মুসলমান বিচারকদের কাছে ধর্না দিবে না। মুসলমানদের মাঝে ইসলামের বিধানানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবে না। তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া আইনকানুন হবে অনৈসলামিক আইনকানুন। মুসলমানদের ওপর আরোপিত বিধিবিধান হবে ইসলামের নির্দেশিত বিধিবিধানের সাথে বিরোধপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক। যেমন— ইসলাম সুদকে করেছে হারাম। চাপিয়ে দেয়া আইন তা বৈধ করে দিবে। পবিত্র কোরআন ব্যভিচারকে করেছে হারাম, আর আরোপিত বিধান তার বৈধতা দিয়ে দিবে। তেমনি মদ, শূকর, জুয়া— ইসলাম করেছে হারাম, আর কার্যকর আইনের আলোকে এগুলো সবই পেয়ে যাবে বৈধতার মর্যাদা।

এর আলোকে অনুমিত হয়, দেশে যদি একই সাথে ইসলামি বিধান এবং কুফরি বিধান জারি করা হয়, তবে দারুল ইসলাম দারুল হারব হিসেবে গণ্য হবে না; যেমনটা আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ.ও বলেছেন।

২. দেশটি দারুল হারব সংলগ্ন, তার সাথে লাগোয়া এবং দারুল হারবের প্রতিবেশি রাষ্ট্র হতে হবে। তার মাঝে এবং দারুল হারবের মাঝে কোনো ইসলামি ভূখণ্ড অন্তরায় হতে পারবে না, যার থেকে মুসলমানদের সাহায্য আসতে পারে। কোনো দেশকে যদি চারিদিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘিরে রাখে, আর তার ওপর কারো ক্ষমতা নাও থাকে, তখনও তা অনৈসলামিক ভূখণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না।

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ. বলেন, "এর আলোকে তো প্রতিভাত হয় যে, সমুদ্র কোনো অন্তরায় নয়। এরপর তিনি দু'দল ফকিহের অভিমত নকল করেন। প্রথম দল বলছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের হুকুম দারুল হারবের হুকুমে। অপর দল বলছেন, সমুদ্র কোনো গোষ্ঠীরই নয়; যেহেতু তার ওপর কারো ক্ষমতাই কার্যকর নয়।"

শামি রহ. আরো বলেন, "এর মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, 'বিলাদুশ শামের' অধীনে যে 'জাবালু তাইমিল্লাহ', যার অপর নাম 'জাবালে দারুয' এবং তার অনুগামী আরো কিছু শহর— এগুলো সব দারুল ইসলাম। কেননা যদিও এসব শহরের

শাসক দারুয বা নাসারা এবং তাদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে, যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে, তাদের কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে গালমন্দ-কটুক্তি করে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলিম শাসকদের ফায়সালার অধীনস্থ। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাগুলোকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই তাদের মাঝে আমাদের বিধান বাস্তবয়িত করতে চাইবেন, তখন তা করতে পারবেন।"

৩. সেখানে কোনো মুসলিম কিংবা কোনো যিম্মি মুসলিম শাসক প্রদত্ত পূর্বের আমান (নিরাপত্তা) –এর মাধ্যমে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত থাকবে না। অর্থাৎ কাফিরদের আক্রমণের পূর্বে মুসলমান তার ইসলামের কারণে এবং যিম্মি তার যিম্মা চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম সরকারের পক্ষ থেকে যে আমান (নিরাপত্তা) লাভ করেছিলো, তা হারিয়ে যাওয়া। এখন তারা যদি নিরাপত্তাপ্রাপ্তও থাকে, তবে তা মুশরিকদের তরফ থেকে প্রদত্ত নিরাপত্তা; মুসলমানদের পক্ষ থেকে নয়।

আরো স্পষ্ট করে বলা হলে, মুসলমান কিংবা যিম্মিরা এখন এই ভূখণ্ডে অবস্থান করা এবং নিরাপত্তা লাভ করাটা তারা ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নয়; বরং তাদের অবস্থানের বৈধতা ও নিরাপত্তা এই অঞ্চলের নতুন হারবি শাসকের সাথে কৃত 'আহদে'র মাধ্যমে। ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়ে তারা এখন অনৈসলামিক শক্তির অধীনে। [প্রাগুক্ত এবং ফিকহুল মুলুক— ১/৪৬৩]

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল

১. হুকুম যখন কোনো ইল্লতের (Cause) মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তো যতোক্ষণ ইল্লতের কিছু অংশও বাকি থাকে, তার কারণে হুকুমও বাকি থাকে। তাই যেহেতু কোনো ভূখণ্ড ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয়, তো যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের কিছু বিধান এবং কিছু নির্দেশনা জারি থাকবে, সেই পর্যন্ত তা দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য হবে। [জামিউল ফুসুলাইন— ১/১৩]

২. আল্লামা কাসানি রহ. বলেন, "ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্যের কারণ হলো, দার (ভূখণ্ড) কে ইসলাম এবং কুফরের দিকে নিসবত করার দ্বারা আসলে তো ইসলাম কিংবা কুফর –এর হাকিকত উদ্দেশ্য নয়। (ভূখণ্ড তো আর মুসলমান

বা কাফির হয় না)। উদ্দেশ্য হলো আমান (নিরাপত্তা) এবং খাওফ (ভীতি)।

এর অর্থ হলো, যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য আমান (নিরাপত্তা) থাকে, আর কাফিরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে খাওফ (ভীতি) থাকে (পূর্ণ নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য আলাদা চুক্তি করতে হয়), তাহলে তা দারুল ইসলাম। আর যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য খাওফ (ভীতি) থাকে আর কাফিরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে থাকে আমান (নিরাপত্তা), তাহলে তা দারুল কুফর। হুকুমের ভিত্তি হলো আমান এবং খাওফ (নিরাপত্তা এবং ভীতি) –এর ওপর, হাকিকি ইসলাম এবং কুফরের ওপরের নয়। তাই আমান এবং খাওফকেই বিবেচনায় নেয়াটা উত্তম। তো যতোক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে হবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে আমান রয়েছে ধরা হবে। তাই তা দারুল কুফরে পরিণত হবে না।

তেমনিভাবে সাধারণ নিরাপত্তা তখনই বিনষ্ট হওয়া সম্ভব, যখন সে অঞ্চলটা দারুল হারব সংলগ্ন হবে। তাহলে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল— আমান (নিরাপত্তা) নষ্ট হওয়া এবং দারুল হারবের সংলগ্ন অঞ্চল হওয়া।

'দার'কে ইসলামের দিকে নিসবত করার হেতু (Cause) সেটাও হতে পারে যা সাহিবাইন বলেছেন (সাহিবাইনের মাযহাবের প্রমাণ দ্রষ্টব্য), আর তাও হতে পারে যা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পক্ষে আমরা বলছি। অর্থাৎ সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত থাকা। কাফিরদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আলাদা 'যিম্মাহ চুক্তি' কিংবা 'ইস্তিমান চুক্তি' প্রয়োজন। (বিস্তারিত বিবরণ সিরিজের অন্য লেখায় আসবে ইনশাআল্লাহ।)

দারকে ইসলামের দিকে নিসবত করার হেতু যদি তা হয়, যা সাহিবাইন বলেছেন, তাহলে কোনো অঞ্চল দারুল কুফর হিসেবে গণ্য হবে সেই কারণে, যা তারা বলেছেন। আর যদি এই নিসবতের হেতু তা হয়, যা আমরা বলেছি, তাহলে তখনই দারুল হারব হিসেবে গণ্য হবে, যখন আমাদের বর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া যাবে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত দারুল ইসলাম শুধু সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে দারুল কুফরে পরিণত হবে না; স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে— ''যা সুনিশ্চিতভাবে

প্রমাণিত তা সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে বিদূরিত হয় না।'' [এই কায়দা (মূলনীতি) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন— আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ির, ইবনে নুজাইম— ৫৭; আলআশবাহ, সুয়ুতি— ৫৩; আলমানসুর ফিল কাওয়ায়িদ, যারকাশি— ২/২৫৫; শরহুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যা, যারকা— ৩৫-৪১; দুরারুল হুককাম— ১/২০]

তবে দারুল কুফরের বিষয়টা ভিন্ন। সেখানে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। কেননা সেখানে ইসলামের দিকের প্রাধান্য। (যদিও বাহ্যত মনে হয়, সেখানে সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে সুনিশ্চিত বিষয়কে রহিত করা হয়েছে, কিন্তু) হাদিসের কারণে সেখানে সন্দেহ-সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। (আর সুনিশ্চিত বিষয়ের মাধ্যমে আরেকটা সুনিশ্চিত বিষয় দূর হতে পারে।) হাদিসটি হলো—

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

ইসলাম উন্নীত থাকে। তার ওপর অন্য কিছু উন্নীত হয় না। (হাদিসটি ইবনে আব্বাস রা. থেকে মাওকুফ এবং সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন— সহিহ বুখারি, জানাযা অধ্যায়, তা'লিক— ৩/২১৮। ইমাম তহাবি রহ. হাদিসটিকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন— ৩/২৫৮। আব ইয়া'লা খলিলি আলফাওয়ায়িদে এবং রুওয়ানি আলমুসনাদে হাসান সূত্রে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আরো দেখুন— সুনানে দারাকুতনি— ৩/২৫২; সুনানে বায়হাকি— ৬/২০৫; দালায়িলুন নুবুওয়াহ— ৬/৩৬; দালায়িল, আবু নুয়াইম— ৩২১। দেখুন— নাসবুর রায়াহ— ৩/২১৩; ফাতহুল বারি— ৩/২২০; আততালখিসুল হাবির— ৪/১২৬; তাগলিকুত তা'লিক— ২/৪৯০; ফায়জুল কাদির— ৩/১৭৯; ইরওয়াউল গালিল— ৫/১০৬-১০৯)

এরপর আল্লামা কাসানি রহ. বলেন, "নিসবত যদি ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবেচনায়ও হয় (যেমনটা সাহিবাইনের অভিমত), তবুও কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উপরিউক্ত দুটো শর্ত প্রয়োজন— অর্থাৎ, দারুল হারবের সংলগ্ন হওয়া এবং পূর্বের আমান (নিরাপত্তা) নষ্ট হয়ে যাওয়া। কেননা কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে কেবল প্রতিরক্ষাবাহিনীর মাধ্যমে। আর প্রতিরক্ষাশক্তি সেই দু'শর্তের মাধ্যমেই অস্তিত্ব লাভ করে। [বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫-৪৩৭৬]

দুই মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য কী?

উপরিউক্ত আলোচনা স্পষ্টভাবে বুঝলে এ বিষয়টাকে আলাদা করে আর বলার প্রয়োজন পড়ে না। তারপরও বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য আমরা এ শিরোনামে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং অন্য সকল ইমামই কোনো ভূখণ্ডের ওপর বিধানারোপ করার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে শক্তি এবং প্রাধান্যতাকে বিবেচনায় নিয়েছেন। তবে তাদের মাঝে যে বিষয়ে এসে ইখতিলাফ হয়ে গেছে, আল্লামা সারাখসি রহ. এর ভাষায় তা হলো—

"কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. বিবেচনায় নিয়েছেন বল এবং শক্তির পূর্ণতা। কেননা এই শহর ইতিপূর্বে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, মুসলমানদের রক্ষণকারী হিসেবে। এখন সেই ইহরায (রক্ষণশক্তি) মুশরিকদের পূর্ণ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমেই বিতাড়িত হওয়া সম্ভব। আর তা এই তিন শর্ত সম্মিলিতভাবে পাওয়া গেলেই সম্ভব। কেননা যখন তা দারুশ শিরক সংলগ্ন না হবে, তখন চারিদিক থেকে মুসলমানদের বেষ্টনীর মাঝে থেকে তার অধিবাসীরা পরাভূত থাকবে। তেমনি সেখানে মুসলমান এবং যিম্মি যদি (পূর্বের নিরাপত্তার অধীনেই) নিরাপদ থাকে, তবে তা মুশরিকদের পূর্ণ প্রতাপ না থাকার প্রমাণ। এর দৃষ্টান্ত হলো সেই মাসআলা, হারবিরা যদি দারুল ইসলামে অবস্থানরত কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তবে তাদের নিজেদের দেশে সংরক্ষণ করার পূর্ব পর্যন্ত তারা সেই সম্পদের মালিক হয় না; যেহেতু পূর্ণ প্রতাপ নেই।

এরপর যতোক্ষণ মূলের নিদর্শনসমূহের কোনো একটাও বাকি থাকে, তখন হুকুম তার ওপরই হয়, আপতিত বিষয়ের ওপর নয়। যেমন কোনো মহল্লা, যতোক্ষণ তার মাঝে একজন বাড়িওয়ালাও থাকবে, ততোক্ষণ হুকুম তার ওপরেই হবে, সে পর্যন্ত সেখানে নতুন আবাসগ্রহণকারী এবং ক্রেতাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই ভূখণ্ড তো মূলত দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, তো যতোক্ষণ তার মাঝে কোনো মুসলিম কিংবা যিম্মি (পূর্বের নিরাপত্তার অধীনে নিরাপদ) থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মূলের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে একটি নিদর্শন তো বাকি থাকবে। সুতরাং সেই হুকুম (অর্থাৎ, দারুল ইসলাম থাকা এবং দারুল হারবে পরিণত না হওয়া) বাকি থাকবে। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর একটি উসুল।

তেমনই প্রত্যেক জায়গার হুকুমের ক্ষেত্রে তার আশপাশের জায়গার অবস্থা বিবেচ্য। সুতরাং যখন এই ভূখণ্ডের চারিদিকে দারুল ইসলাম, তখন এই ভূখণ্ডের ওপর দারুল হারবের বিধান আরোপিত হবে না। যেমনিভাবে সেখানে শিরকি বিধান প্রতিষ্ঠিত না হলে তা আরোপ করা হতো না। মুরতাদরা এর ওপর দিনের কিছু সময়ের জন্য দখল নিয়েছে মাত্র।" (ফুঁ দিলেই আবার উড়ে যাবে।) [আলমাবসুত— ১০/১১৪]

তাতাররা যখন ইসলামি ভূখণ্ডের ওপর তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে, তখন ফকিহগণের ফতোয়া দু'রকমই ছিলো। ওপরে আমরা আল্লামা ইবনে নুজায়ম রহ. এর ফতোয়া উদ্ধৃত করেছি। তিনি সাহিবাইনের অভিমতের আলোকে তখন তাতারদের পদানত রাষ্ট্রগুলোকে দারুল হারব বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এবার আমরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অভিমতের আলোকে প্রদত্ত ফতোয়ার নমুনা দেখবো।

ইমাম ইবনুল বাযযায কারদারি ইমাম আবু শুজা' রহ. এর ফতোয়া উল্লেখ করেন, "আজ (হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে) যে-সব ভূখণ্ড কাফিরদের হাতে, সন্দেহ নেই যে, এ জায়গাগুলো দারুল ইসলাম। যেহেতু তা দারুল হারবের সাথে সংযুক্ত নয় এবং তাতে কুফরি বিধানও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং বিচারকরা মুসলমান। এবং শাসকরা— জরুরতের কারণে যাদের তারা আনুগত্য করে, তারা মুসলমান আর জরুরত ছাড়া যাদের আনুগত্য করে, তাদের আনুগত্য 'মুওয়াদাআ'। যেসব অঞ্চলের ওপর তাদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত মুসলমান গভর্নর রয়েছে, সেখানে জুমআ ঈদ কায়িম করা, খারাজ উশুল করা এবং বিচারকদের তাকলিদ করা বৈধ। ...তার কাফিরদের আনুগত্য করাটা 'মুওয়াদাআ' বা 'মুখাদাআ'। ...আর এ উসুল তো স্থির হয়েছে যে, ইল্লতের কিছু অংশ বাকি থাকার দ্বারাও হুকুম বাকি থেকে যায়। আর আমরা সবাই তো –কোনো ইখতিলাফ ছাড়াই- হুকুম আরোপ করেছি যে, তাতারদের দখলদারিত্বের পূর্বে এই অঞ্চলগুলো দারুল ইসলামের অন্তর্গত ছিলো। আর তাদের দখলদারিত্বের পরে, আজান দেয়া, জুমআ জামাআত আদায় তাদের শাসকদের তরফ থেকে কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই চলছে। তাই এসব অঞ্চলের ওপর দারুল হারবের বিধান আরোপ করার কোনো কারণ নেই।" [ফাতাওয়া বাযযাযিয়া— ৩/৩১১-৩১২]

এরপর তিনি হানাফিদের শায়খ শামসুল আয়িম্মাহ আব্দুল আযিয আলহালওয়ানি রহ. এর ফতোয়া উল্লেখ করেন, "কোনো ভূখণ্ড দারুল হারব হয়— যখন সেখানে কুফরের বিধান জারি করা হয়। সেখানে কোনো ফায়সালা ইসলামের বিধানের আলোকে করা হয় না। এবং তা দারুল হারব সংলগ্ন হয়। আর সেখানে কোনো মুসলিম কিংবা কোনো যিম্মি পূর্বের নিরাপত্তার অধীনে নিরাপদ থাকে না। যখন এই সবগুলো শর্ত পাওয়া যায়, তখন কোনো দেশ দারুল হারব হয়। যখন দলিল এবং শর্তের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়, তখন দেশ যা ছিলো তা-ই থাকবে। অথবা সতর্কতার দাবি হিসেবে ইসলামের দিকটাই প্রাধান্য পাবে। তুমি দেখছো না যে, শুধু ইসলামের বিধান জারি করার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়।" [প্রাগুক্ত; আল্লামা তুমুরতাশি রহ. ও এমন ফতোয়া উল্লেখ করেছেন দুই মহান ইমামের থেকে— ইমাম ইসবিজানি এবং ইমাম ইমাদি রহ.। দেখুন— আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; জামিউর রুমুযের উদ্ধৃতিতে কাশশাফুল ইসতিলাহাত— ২/২৫৬]

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ফতোয়া

দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয় —এ বিষয়ে আমরা পূর্বের লেখায় সবিস্তারে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা প্রসিদ্ধ চার ইমামের ফতোয়া উল্লেখ করেছি; যার সারকথা— ইমাম মালিক ইমাম শাফেয়ি এবং ইমাম আহমদ আর আমাদের মাযহাবের সাহিবাইন— অর্থাৎ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. —এর মতে কোনো ইসলামি ভূখণ্ডে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারাই তা দারুল হারব হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা রহ. —এর মতে তিনটি শর্ত সম্মিলিতভাবে পাওয়া গেলেই কেবল কোনো ভূখণ্ড দারুল হারব হয়; অন্যথায় নয়। শর্ত তিনটির বর্ণনাও আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

আজ আমরা এই মাসআলার পরিশিষ্টে অন্যান্য ফকিহগণের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ফতোয়া উল্লেখ করবো।

কোনো কোনো মালেকি ফকিহের অভিমত হলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত দেশে ইসলামের শা'আইর কায়িম করা যাবে, (যেমন আযান দেয়া, ঈদ জুমআ ও নামাজের জামাত আদায় করতে পারা ইত্যাদি। শা'আইরের ব্যাখ্যা এই লেখার শেষাংশে দ্রষ্টব্য।) তখন পর্যন্ত দেশ দারুল হারব হবে না।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আ'রাফা দাসুকি রহ. (মৃত্যু— ১২৩০ হি.) বলেন, "কাফিরদের দখলদারিত্বের মাধ্যমেই কেবল ইসলামি রাষ্ট্র দারুল হারব হবে না। বরং যতোক্ষণ পর্যন্ত শা'আইরে ইসলাম পালনের সুযোগ থাকবে, তখন পর্যন্ত রাষ্ট্র দারুল ইসলামই থাকবে। যে পর্যন্ত রাষ্ট্রে ইসলামের সবগুলোর শা'আইর কিংবা তার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সে পর্যন্ত রাষ্ট্র দারুল হারব হবে না।" [হাশিয়াতুদ দাসুকি আলাশ শারহিল কাবির— ২/১৮৮]

কোনো কোনো শাফেয়ি ফকিহের অভিমত— যে দেশে মুসলমানরা বসবাস করতো, এরপর কাফিররা তা দখল করে নিয়ে সেখানে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে, কুফরি বিধান-সংবিধান জারি করেছে, তা দারুল ইসলামই থাকবে; দারুল হারবে পরিণত হবে না।

শায়খ যাকারিয়া আনসারি রহ. (মৃত্যু— ৯২৬) বলেন, "যে দেশে একজন মুসলমানও বসবাস করে, তা দারুল ইসলাম। সুতরাং সেখান থেকে হিজরত করা হারাম। যাতে করে তা দারুল হারবে পরিণত না হয়ে যায়।" [শারহু মানহাজিত তুল্লাব— ৪/২৪৪; আসনাল মাতালিব— ৪/২০৪]

আল্লামা শামসুদ্দীন রামালি রহ. (মৃত্যু— ১০০৪ হি.) দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করেছে— এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, "সে যদি সেখানে হারবিদের থেকে নিরাপদে থেকে আলাদাভাবে বসবাস করতে পারে আর (ইসলামি ভূখণ্ডে) হিজরত করার দ্বারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির আশাও না থাকে, তাহলে সেখানে তার অবস্থান করা ওয়াজিব। কেননা তার অবস্থানস্থল এখন দারুল ইসলামই রয়েছে। সে হিজরত করলে দারুল হারব হয়ে যাবে। ...এর থেকে এ মাসআলাও গৃহীত হয় যে, প্রত্যেক এমন জায়গা, যেখানকার অধিবাসীরা হারবিদের থেকে নিরাপদে থাকতে পারে, তা দারুল ইসলাম থাকবে। সুতরাং কাফিরদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও তা দারুল কুফর হিসবে গণ্য হওয়াটা অসম্ভব। যেমনটা স্পষ্টভাবে হাদিসের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, "ইসলাম উন্নীত থাকবে। তার ওপর অন্য কিছু উন্নীত হবে না। (হাদিসের তাখরিজ পূর্বের পোস্টে দ্রষ্টব্য)। তাই ফকিহগণ যে বলেন, 'অমুক দেশ তো দারুল হারব হয়ে গেছে' —এর দ্বারা বাহ্যত (সুরাতান) তা দারুল হারব হওয়াটা উদ্দেশ্যে; হুকুমের বিচারে নয়। অন্যথায় তো অপরিহার্য হয় যে, তারা দারুল ইসলামের যে অংশ দখল

করবে, তা-ই দারুল হারব হয়ে যাবে। এটা তো দুরূহ।" [নিহায়াতুল মুহতাজ— ৮/৮২, ৫/৪৫৪; মুগনিল মুহতাজ— ৪/২৩৯; হাশিয়াতুল কালয়ুবি এবং হাশিয়াতু উমায়রা— ৪/২২৭]

স্পেনে খ্রিস্টানদের দখল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আরগুনের মুসলমানদেরকে তিনি এই ফতোয়াই দিয়েছিলেন— "বরং এখান থেকে হিজরত করা জায়িয নেই। কেননা মুসলমানদের অবস্থানের দ্বারা অন্যান্যদের ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশা থাকে। আরেকটি কারণ হলো, এ ভূখণ্ড তো দারুল ইসলাম। এখন তারা যদি হিজরত করে, তবে তা দারুল হারব হয়ে যাবে। [ফাতাওয়া রামালি, ইবনে হাজার হাইতামির 'আলফাতাওয়াল কুবরা'র হাশিয়ায় প্রকাশিত—৪/৫৩-৫৪; নিহায়াতুল মুহতাজ— ৫/৪৫৪]

তাদেরও আগে ইমাম রাফেয়ি রহ. (মৃত্যু— ৬২৩ হি.) —এর বক্তব্যেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "দারুল ইসলাম তিন প্রকার।

১. এমন দেশ, যেখানে মুসলমানরা বাস করে।

২. এমন দেশ, যা মুসলমানরা বিজয় করেছে।

৩. এমন দেশ, যেখানে মুসলমানরা বসবাস করতো। এরপর তারা নির্বাসিত হয়েছে আর কাফিরদের আধিপত্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

কাফিরদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি সেই দেশকে দারুল ইসলামই গণ্য করছেন। এরপর তিনি এই ব্যাপক কথাটিকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন।

"ফকিহগণ (আসহাবুশ শাফেয়ি রহ.) যে তৃতীয় প্রকারকেও দারুল ইসলাম গণ্য করেছেন, তার কারণ হলো, তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের পূর্বের কর্তৃত্ব (দারুল ইসলাম থাকার) হুকুম বাকি থাকার জন্য যথেষ্ট। মুতাআখখির (পরবর্তী) কোনো ফকিহকে দেখেছি, তারা এই বক্তব্যকে সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, যখন হারবিরা মুসলমানদের জন্য বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যদি তা করে, তবে সেই দেশ দারুল কুফর।" [আলআযিয শরহুল ওয়াজিয— ৬/৪২৩-৪২৪; রাওযাতুত তালিবিন, নববি— ৫/৪৩৩-৪৩৪]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু— ৭২৮ হি.) কে 'মারিদিন' শহর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো— তা কি দারুল ইসলাম নাকি দারুল হারব? তিনি

উত্তর দিলেন, "তা দারুল হারব নাকি দারুল ইসলাম —এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তা হলো যৌগিক দেশ, যার মাঝে দু'দিকই পাওয়া যায়। তা দারুল ইসলামের পর্যায়ে নয়, যেখানকার সেনাবাহিনী মুসলমান হওয়ার কারণে তাতে ইসলামি বিধান কার্যকর রয়েছে। আবার দারুল হারবের পর্যায়েও নয়, যার অধিবাসীরা কাফির-বেইমান। বরং তা তৃতীয় একটি প্রকার। সেখানকার মুসলমানদের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী আচরণ করা হবে। আর ইসলামি শরিয়ত থেকে যারা খারিজ, তাদের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী কিতাল করা হবে।" [ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া— ২৮/২৪০-২৪১]

পাঠকের এ কথা বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, উপরিউক্ত সবগুলো ফতোয়াই হলো বিচ্ছিন্ন মতামত, যা মাযহাবের ইমামগণের বক্তব্য-অভিমতের সাথে বিরোধপূর্ণ। এজন্য উম্মাহর ফকিহগণ এসব বিচ্ছিন্ন মতামত গ্রহণ করেননি। যারা বড়, তাদেরও দু-চারটি বিচ্ছিন্ন মতামত থাকতেই পারে। এক্ষেত্রে তারা অনুসরণীয় নন। মাওলানা আবদুল মালেক দা. বা. প্রায়ই বলেন, "যাল্লাত (ভুল-বিচ্যুতি) —এর ক্ষেত্রে কারোরই অনুসরণ জায়িয নেই।" এজন্য ইবনু তাইমিয়া রহ. —এর শাগরিদ ইবনু মুফলিহ রহ. পর্যন্ত মহান ইমামগণের সর্বসম্মত মতকে বাদ দিয়ে উস্তাদের এই বিচ্ছিন্ন অভিমত গ্রহণ করেননি। (দেখুন— আলআদাবুশ শারইয়্যাহ— ১/২১২)। তবে এই দু-চারটি বিচ্ছিন্ন মত এবং ভুলের কারণে কোনো ইমাম বা ফকিহের বিরুদ্ধে 'যবানদারাযি' করারও কোনো সুযোগ নেই। ইমাম মালিক রহ. সুন্দর বলেছেন—

كل يؤخذ من قوله و يترك، إلا صاحب هذا القبر؛ يعني: النبي صلى الله عليه و سلم

."সবাই এমন, যার কিছু কথা গ্রহণ করা হয় আর কিছু কথা পরিত্যাগ করা হয়, শুধু এই কবরের মানুষটি— অর্থাৎ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ছাড়া।" (ইমাম বুখারি 'কিরাত খালফাল ইমাম' অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস রা. এবং মুজাহিদ রহ. থেকেও অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।) উদ্দেশ্য হলো, একমাত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই এমন, যার সব কথা ও কাজ গ্রহণীয়। এ ছাড়া অন্য যতো মানুষ আছে, সাহাবি তাবেয়ি কিংবা উম্মাহর বিদগ্ধ যতো আলিম এবং ফকিহ, সবার ব্যাপারে একই কথা— চোখ বুজে তাদের সব কথা-কাজের

অনুসরণ করার সুযোগ নেই। কেননা একমাত্র নবি ছাড়া কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়। এ যুগে তো কিছু মানুষ এমনও পাওয়া যায়, যারা খুঁজে খুঁজে সালাফের বিচ্ছিন্ন মতগুলো বের করে সেগুলোর অনুসরণ করে, সামাজিক মাধ্যমেও তা প্রচার করে। শায়খুল ইসলাম দা. বা. —এর ভাষায়, তারা মূলত শরিয়ত নিয়ে খেলা করছে। শরিয়তকে তাদের মানস-প্রবৃত্তির অনুগামী বানিয়ে নিয়েছে। আদতে তারা শরিয়তের অনুসরণ করে না। করে নফসের পূজা।

টীকাঃ 'শাআইর' কাকে বলে

মাওলানা আবদুল মালেক দা. বা. এ বিষয়ে যা বলেছেন—

'শাআইর' আরবী শব্দ। 'শায়ীরাতুন' এর বহুবচন। 'শায়ীরাতুন' অর্থ হচ্ছে, নিদর্শন, প্রতীক। তাহলে 'শাআইরুল্লাহ' অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন। কোরআন-হাদীসে শাআইরের ব্যাখ্যা এসেছে; যার সারসংক্ষেপ এই যে, আল্লাহ তাআলা বিশেষ কিছু স্থান, কিছু কাজ এবং কিছু বস্তুকে সম্মানিত করেছেন এবং সেগুলোকে তাঁর কুদরত ও আযমতের চিহ্ন সাব্যস্ত করেছেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিদর্শন ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলার আদেশের কারণে এগুলো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। শীর্ষস্থানীয় শাআইরের মধ্যে রয়েছে, কালামুল্লাহ অর্থাৎ কোরআন মজীদ এবং কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কালিমা। কালেমা তাইয়্যেবা, কালেমা শাহাদত ইত্যাদি। বিশেষ স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে বাইতুল্লাহ, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং ইহুদীদের কব্জায় থাকা মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসা। এরপর সকল মসজিদ। তদ্রূপ আরাফা, মিনা-মুযদালিফা 'শাআইরুল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত। কুরবানীর পশুও শাআইরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন—

http://www.alkawsar.com/article/৬৫]

দারুল ইসলাম দারুল হারব বিভক্তি কি ফকিহদের আবিষ্কার, নাকি কোরআন সুন্নাহর শিক্ষা?

এখন তো সব কিছুতে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তার লাভ করেছে। মুক্তমনা আধুনিকমনস্ক কিছু কিছু লেখক দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের বিভক্তির

অসারতা প্রমাণ করে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ বই রচনা করছে। তাদের দাবি, ইসলাম তো অসাম্প্রদায়িক ধর্ম, শান্তির ধর্ম। ইসলামের মূল চেতনার সাথে নাকি এই বিভক্তি খাপ খায় না। তাই তারা ইসলামের 'ইমেজ' রক্ষার্থে কেউ কেউ তো এই বিভক্তিকেই গোড়া থেকে অস্বীকার করেছেন, আর কেউ কেউ নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে পুরো দুনিয়াকেই দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য করেন। তাদের ব্যাখ্যার আলোকে কোনো দেশ বা ভূখণ্ড দারুল হারব হয় না। সর্বোচ্চ কোনো কোনোটাকে তারা দারুল আমান অভিধায় অভিহিত করেন।

প্রথমে আমরা তাদের দাবিগুলোর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি। এরপর শরিয়তের দৃষ্টিতে সেগুলোর পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

১. এই বিভক্তির ভিত্তি বাস্তবতার ওপর, শরিয়তের নির্দেশনার ওপর নয়। হিজরি দ্বিতীয় শতকে ফকিহদের মাধ্যমে এই বিভক্তি ও বন্টন অস্তিত্ব লাভ করে। এই বন্টনের মানাত হলো আমন এবং খাওফ (নিরাপত্তা এবং ভীতি)। এক্ষেত্রে তারা ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যকেও প্রয়োগ করতে চান। তো ভিনদেশ বা দারুল হারব তাই হবে, যার সাথে কোনো কারণে ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

২. এটা একটা আপতিত অবস্থার বন্টন। সর্বদা প্রয়োগ করা হবে এমন নয়। যখন মুসলমান এবং কাফিরদের মাঝে যুদ্ধ চলমান থাকবে কিংবা এই বন্টনকে অপরিহার্য করে এমন কোনো কারণ পাওয়া যাবে, তখনই কেবল এই বিভক্তিকে মেনে নেয়া হবে। কোনো দেশকে দারুল হারব ফতোয়া দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয়াটা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম তো তাদের হেদায়াত চায়। আর এর মাধ্যম হলো শান্তিপূর্ণ দাওয়াত। তো দাওয়াতের স্বার্থেই এই বন্টনকে সার্বক্ষণিকভাবে মেনে নেয়া যায় না। ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে যার শান্তিচুক্তি ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে, তা কখনো দারুল হারব হয় না। দারুল হারব তখন হয়, যখন কোনো দেশের সাথে যুদ্ধ চলে।

৩. মৌলিকভাবে পুরো দুনিয়া একটি ভূখণ্ড, এক দার; যেমনটা ইমাম শাফেয়ি রহ. ও বলেছেন।

৪. কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম কিংবা দারুল হারব হওয়ার কারণে বিভিন্ন বিধানে যে ভিন্নতা হয়, তাও শুধু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতে প্রযোজ্য। এটা শান্তি বিনষ্টকারী যুদ্ধের বদ প্রভাবগুলোর একটি।

৫. হারবি শব্দটি শত্রু অর্থে নয়। দু'দেশের মাঝে শত্রুতা বিরাজ করবে শুধু যুদ্ধাবস্থায়। যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেলে পুনরায় পুরো দুনিয়া একই দার হিসেবে গণ্য হবে। নেই কোনো বিভেদ কিংবা বিভক্তি। সকলে ভাই ভাই।

এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো শুধু অমুসলিম প্রাচ্যবিদ গবেষকদের। এরপর একশ্রেণির বিদগ্ধ মুসলিম ফকিহও তাদের সঙ্গ দিয়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের বক্তব্যে চিরুনি অভিযান চালিয়ে, তাদের বক্তব্য থেকে ইল্লত (Cause) বের করে অমুসলিমদের এই দাবিকে শক্তিশালী করার প্রয়াস পেয়েছে। প্রতিথযশা দু-চারজন ফকিহও চেতনে বা অবচেতনে এই জালে ফেঁসেছেন। তাদের গ্রন্থাবলি দ্বারা প্রভাবিত শ্রেণির মাঝেও ধীরে ধীরে এই ভাইরাস প্রসার লাভ করেছে। যেমন শায়খ আবু যুহরার আলোচনা থেকে উপরিউক্ত চতুর্থ বিষয়টি প্রতিভাত হয়। ১-৩ বিষয়গুলো ড. ওয়াহবা যুহায়লির আলোচনা থেকে অনুমিত হয়। অন্য কোনো লেখায় সবিস্তারে তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করবো— দারুল ইসলাম দারুল হারবের বিভক্ত কি আদতে ফকিহগণের আবিষ্কার, নাকি শরিয়তের নির্দেশনা।

দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের বন্টন ফকিহদের আবিষ্কৃত কোনো বিষয় নয়। এটা একটা মৌলিক বন্টন, যা শরিয়ত নির্দেশনা করেছে, কোরআন-সুন্নাহ শিখিয়েছে। এই পরিভাষা রাসুলের যুগে ছিলো না ঠিক, তবে এই বন্টন এবং বিভক্তি অবশ্যই ছিলো।

আমরা পবিত্র কোরআনে দেখতে পাই, কোরআন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে, সকল মানুষ এক শ্রেণি নয়। আল্লাহ বলেন—

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ {التغابن:2}

তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের একদল কাফির, একদল মুমিন। {সুরা তাগাবুনঃ ২}

শরিয়ত আমাদেরকে জানায়, এই প্রত্যেক দলের আলাদা আলাদা দেশ এবং ভূখণ্ড থাকবে, যা তাদেরকে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ করে রাখবে। পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াত থেকে আমরা 'দার' বিভক্তির ইঙ্গিত পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত লক্ষ করুন—

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَوَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَإِلَيْهِمْ

এবং তারা, যারা পূর্ব থেকেই ইমানের সাথে সেই 'দারে' অবস্থান করছে। তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে। {সুরা হাশরঃ ৯}

سَأُرِيكُمْ دَارَالْفَاسِقِينَ

আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের 'দার' তোমাদেরকে দেখাবো। {সুরা আরাফঃ ১৪৫}

تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

তোমরা তোমাদের 'দারে' তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। {সুরা হুদঃ ৬৫}

وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً

তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় পুরুষ নারী এবং শিশুদের পক্ষে লড়াই করছো না! যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করো, যার অধিবাসীরা জালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক বানিয়ে দিন। আমাদের জন্য আপনার তরফ থেকে একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন। {সুরা নিসাঃ ৭৫}

যে ভূমিতে আল্লাহর শত্রুরা আল্লাহর বান্দাদেরকে দুর্বল করে রাখে, তাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করে, যার ফলে তারা আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে উপরিউক্ত দুআ করে, যেনো তাদেরকে জালিমদের নিয়ন্ত্রিত এবং যেখানে তাদের শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত তা থেকে আল্লাহ তাদেরকে বের করে আনেন— নিশ্চয়ই তা দারুল ইসলাম নয়, দারুল হারব।

আরো কয়েকটি আয়াত লক্ষ করুন—

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ

مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারবে), যেহেতু তাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে শুধু এজন্য বের করে দেয়া হয়েছে, যেহেতু তারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেয়া হতো খানকাহ-গির্জা, ইবাদতখানা এবং মসজিদসমূহ, যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর সিকির করা হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার দীনের সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের নির্দেশ জারি করবে এবং অসৎকাজের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। আল্লাহরই হাতে সবকাজের পরিণতি। {সুরা হজঃ ৩৯-৪১}

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, কীভাবে কোনো ভূখণ্ড দারুল কুফর হয়। আর তা হলো জুলুমের প্রসার। সর্বোচ্চ জুলুম হলে স্রষ্টার সাথে শিরক করা। এর আরো কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন- মাজলুমদেরকে অন্যায়ভাবে সপরিবারে দেশ থেকে বহিষ্কার করা, ইবাদতের স্থানসমূহ ধ্বংস করা। এরপর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, কীভাবে কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হয়। আর তা হলো তাতে মুসলমানদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে এবং আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া। [দেখুন— কিতাবুল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহঃ ১/৬০০]

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَأُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً

আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিলেন তাদের ভূমি, তাদের ঘরবাড়ি, তাদের ধন-সম্পদ এবং এমন ভূমির, এখনও যেখানে তোমাদের পা পৌঁছেনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। {সুরা আহযাবঃ ২৭}

তো মুসলমানদের বিজিত ভূমি, যেখানে তাদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত, তা দারুল ইসলাম। দারুল কুফর নয়।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً

নিজ সত্তার ওপর জুলুমরত থাকা অবস্থায়ই ফেরেশতাগণ যাদের রুহ কব্*জা করার জন্য আসে, তাদের উদ্দেশে তারা বলে, তোমরা কিসের মাঝে ছিলে? তারা বলে, যমিনে আমাদেরকে অসহায় করা রাখা হয়েছিলো। ফেরেশতাগণ বলবে, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিলো না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে?! সুতরাং এরূপ লোকদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা অতি মন্দ পরিণতি। {সুরা নিসাঃ ৯৭}

যে ভূখণ্ডে মুসলমানদেরকে অসহায় করে রাখা হয়েছে, যেখান থেকে এমন ভূখণ্ডে হিজরত করা ফরজ, যেখানে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত— তা তো নিঃসন্দেহে দারুল হারব। আল্লাহ তাআলার হিজরতের নির্দেশ থেকেও তো দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের বিভক্তি অনুমিত হয়। সারা দুনিয়া একই ভূখণ্ড হলে তবে হিজরতের নির্দেশ কেনো?!

নিচের আয়াতগুলোও দেখা যেতে পারে।

قَالَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

রাসুলের যিন্দেগির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তৎকালীন মক্কা এবং মদিনার অবস্থা বিশ্লেষণ করলে এবং হিজরতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে বিষয়টা যথাযথভাবে বোধগম্য হয়। তাছাড়া সুন্নাহ এবং সাহাবিদের আসারে আমরা এ বিষয়গুলোর বিবরণ পাই। আমরা তাতে 'দারুশ শিরক', 'দারুস সুন্নাহ', 'দারুল হিজরাহ', 'দারুল ইসলাম' (শেষোক্ত তিনটি একই অর্থে) শব্দগুলোর ব্যবহার দেখতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ করুন—

عن جابر بن زيد قال قال ابن عباس إن رسول الله ﷺ و أبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله ﷺ ليلة العقبة

জাবির ইবনে যায়দ রা. থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. আবু বকর উমর রা. মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা তারা মুশরিকদেরকে ত্যাগ করেছেন। আনসারিদের মধ্যেও মুহাজির ছিলো। কেননা মদিনা একসময় 'দারুশ শিরক' ছিলো। লাইলাতুল আকাবায় তারা রাসুলুল্লাহ সা. এর কাছে আসলেন। {সুনানে নাসায়ি, কিতাবুল বাই'আহ, তাফসিরুল হিজরাহঃ ৭/১৪৪-১৪৫, হাদিস নাম্বারঃ ৪১৬৬}

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين

...যখন তোমাদের শত্রু মুশরিকদের মুখোমুখি হও, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করো। তারা যে-কোনোটাকে কবুল করে নিলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নাও এবং তাদের থেকে নিবৃত্ত থাকো। এরপর তাদেরকে ইসলামের

দিকে আহ্বান করো। যদি তারা সাড়া দেয়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নিজেদের হাত গুটিয়ে নাও। এরপর তাদেরকে তাদের 'দার' (দারুল হারব) ত্যাগ করে 'দারুল মুহাজিরিনে' স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দাওয়াত দাও। {সহিহ মুসলিমঃ ১৭৩১}

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বর্ণনায় শব্দটা এভাবে এসেছে—

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الإسلام

এরপর তাদেরকে তাদের 'দার' (দারুল হারব) ত্যাগ করে 'দারুল ইসলামে' স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দাওয়াত দাও।

عن سليمان بن بريدة أن أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الايمان أمر عليهم رجلا من أهل العلم والفقه فاجتمع إليه جيش فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي فقال سر باسم الله قاتل في سبيل الله من كفر بالله فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال ادعوهم إلى الاسلام فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أموالهم الزكاة وليس لهم في فئ المسلمين نصيب وإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم...الخ

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা থেকে বর্ণিত, (পুরোটার অনুবাদে যাচ্ছি না) ...যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তোমরা তাদের (হারবিদের) 'দার' (দারুল হারব) এখতিয়ার করো। {কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফঃ ২১০; তারিখুত তবারিঃ ৩/২৬০}

عن عبد الله بن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم و إني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم قالعمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة

...কেননা মদিনা 'দারুল হিজরাহ' 'দারুস সুন্নাহ' 'দারুস সালামাহ'। {সহিহ বুখারিঃ ৩৭১৩}

جاء في رسالة خالد بن الوليد في كتاب الخراج ما نصه: "وجعلت لهم – أي أهل الذمة – أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقاموا بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم."

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. এর উপরিউক্ত চিঠিতেও দেখতে পাচ্ছি— ..."যতোক্ষণ তারা 'দারুল হিজরাহ' – 'দারুল ইসলামে' বসবাস করবে। যদি তারা তারা 'দারুল হিজরাহ' – 'দারুল ইসলামে' ত্যাগ করে অন্য কোনো দিকে মোড় নেয়...। {কিতাবুল খারাজঃ ১৪৪ (অন্য নুসখায়ঃ ১৫৫-১৫৬); কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়দঃ ৯৮}

عن جرير بن عبد الله ﷺ أن النبي ﷺ قال: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قيل يا رسول الله ولمَ؟ قال: لا تراءى ناراهما."

জারির ইবনে আব্দিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সা. বলেছেন, আমি প্রত্যেক এমন মুসলমানের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিচ্ছি, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে। বলা হলো, কেনো হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, তাদের দুই শ্রেণির আগুন একসাথে দেখা যেতে পারে না। { সুনানে তিরমিযিঃ ১৬০৪; সুনানে আবি দাউদ, জিহাদ অধ্যায়; সুনানে নাসায়ি, কাসামাহ অধ্যায়। হাফিজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, এর ইসনাদ সহিহ (বুলুগাল মারাম)। শাওকানি রহ. বলেন, এর সনদের রিজাল সিকাহ।}

একই বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদিস—

عن معاوية بن أبي سفيان ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها"

যতোদিন তাওবার সুযোগ থাকবে, ততোদিন হিজরত থাকবে। আর পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত তাওবার সুযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না। {সুনানে আবি দাউদঃ ২৪৭৯; মুসনাদে আহমাদ; দারেমি}

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله عزوجل من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين."

ইসলাম গ্রহণ করার পরে যে শিরক করবে আল্লাহ তাআলা এমন মুশরিকের থেকে কোনো আমল গ্রহণ করবেন না, যতোক্ষণ না সে মুশরিকদেরকে ত্যাগ করে মুসলমানদের কাছে হিজরত করে। {সুনানে ইবনে মাজাহঃ ২৫৩৬; মুসনাদে আহমাদ; সুনানে নাসায়ি}

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৬৭১

প্রসঙ্গঃ দারুল আমান

আবু বকর সিদ্দিক

Junior Member

১২-০২-২০১৮

আমরা পূর্বের পর্বগুলোতে সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি, যে ভূখণ্ডে ইসলামের বিধান-সংবিধান প্রতিষ্ঠিত, তা-ই দারুল ইসলাম। এর ব্যাপকতার মধ্যে যা যা অন্তর্ভুক্ত হয়—

১. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের শহরেই অবস্থান করে, তবে তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

২. দারুল হারবের কোনো ভূমি বিজয় এবং তার ওপর ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়নের ঘোষণার মাধ্যমেও দেশ দারুল ইসলাম হয়। সারাখসি রহ. বলেন, "মুসলমানরা যদি শত্রুদের কোনো ভূমি বিজয় করে এবং তাদের পূর্ণ দখলে আসে, হারবি অধিবাসীরা পলায়ন করে, তবে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে।" [শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৩/১০০৪-১০০৬, ৪/১২৫৩, ১২৫৭; আলমাবসুত— ১০/২৩, ১১৪]

৩. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি মুসলমানদের সাথে 'যিম্মাহ চুক্তি' করে এবং মুসলমানরা তাদের অঞ্চলে ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করে, তবে তাও দারুল ইসলাম।

৪. সন্ধির মাধ্যমে কোনো দেশ বিজিত হলে তার ভূমি থাকবে মুসলমানদের মালিকানায় এবং হারবি অধিবাসীরা খারাজ প্রদান করে সেখানে অবস্থান করতে পারবে— এটাও দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য হবে।

এই চার প্রকারের বাইরে যা-কিছু আছে, সবই দারুল হারব, অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক। পূর্বের লেখাগুলোতে আমরা পূর্ববর্তী ইমাম ও ফকিহগণের

বক্তব্য উল্লেখের পাশাপাশি উস্তাদ আব্দুল কাদির আওদার ভাষায় দারুল হারবের সুন্দর সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছি। তিনি বলেন, "দারুল হারব প্রত্যেক এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবেশ করেনি, কিংবা যেখানে ইসলামের বিধান প্রকাশিত নয়। এ রাষ্ট্রগুলো একই সরকারের পরিচালনাধীন থাক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন সরকারের— সবই সমান। তার স্থায়ী নাগরিকদের মাঝে মুসলমানরা থাকা বা না থাকা সবই সমান; যতোদিন তারা ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম থাকে।" [আততাশরিউল জিনায়ি আলইসলামি— ১/২৭৭]

আমরা আরো আলোচনা করে এসেছি— দারুল হারব মানে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্র নয়। অনেকে ভাবেন, দারুল হারব শুধু এমন রাষ্ট্রকেই বলা হয়, যা কোনো মুসলিম ভূখণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। বাস্তবতা এমন নয়। কোনো ভূখণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হয় (বিস্তারিত জানতে পূর্বের পর্বগুলো দ্রষ্টব্য) আর কোথাও কুফরি এবং শিরকি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল হারব বলা হয়। দারুল হারবকে অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক ইত্যাদিও বলা হয়। এসব পরিভাষার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। ফকিহগণ দারুল হারবের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। এজন্যই সারাখসি রহ. বলেন, "দারকে আমাদের দিকে বা তাদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে।'' [আলমাবসুত, সারাখসি— ১০/১১৪]

এ বিষয়টাকেই আল্লামা কাসানি রহ. আরো বিস্তারিত করে এভাবে বলেছেন, "কোনো রাষ্ট্রে কুফরের আহকাম-বিধিবিধান প্রকাশিত হলে তা দারুল কুফর হয়ে যায়।... রাষ্ট্র শুধু কুফরের বিধানাবলী প্রকাশিত হওয়ার দ্বারাই দারুল কুফর বলে গণ্য হয়।" [বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫; আরো দেখুন— আহকামুদ দিয়ার, আবিদ সুফয়ানি— ১৫]

বোঝা গেলো, কোনো রাষ্ট্র দারুল হারব (অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক) হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লড়াই-যুদ্ধ চলমান থাকা অপরিহার্য নয়। এজন্যই হাম্বলি ফকিহগণ বলেন, "হারবি শব্দটা হারবের দিকে সম্পর্কিত। হারব অর্থ— কিতাল (লড়াই), তেমনি এর অর্থ দূরত্ব এবং বিদ্বেষও। তো দারুল হারব

অর্থ হলো এমন রাষ্ট্র, যার সাথে মুসলমানদের দূরত্ব কিংবা মুসলমানদের প্রতি রয়েছে যার বিদ্বেষ। হারবিকে হারবি এই দ্বিতীয় অর্থ, তথা দূরত্ব এবং বিদ্বেষ— এর বিচারেই বলা হয়। কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা জরুরি নয়। [আলমুতলি' আলা আবওয়াবিল মুকনি', বা'লি— ২২৬]

উম্মাহর ফকিহগণের আলোচনা থেকে তো স্পষ্ট অনুমিত হয়, দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের বাইরে আর কোনো বিভক্তি তাদের দৃষ্টিতে ছিলো না। সমগ্র পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত; একভাগের নাম দারুল ইসলাম, আরেক ভাগের নামের দারুল হারব। তৃতীয় আর কিছু নেই। এ ব্যাপারে উম্মাহর বিদগ্ধ ফকিহণের ঐকমত্য রয়েছে। এখানে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজনের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

কাজি আবু ইয়া'লা রহ. বলেন, "প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড যেখানে বিজয় কুফরের নয়, ইসলামের বিধান-সংবিধানের, তা দারুল ইসলাম। আর প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড যেখানে বিজয় ইসলামের নয়, কুফরেরর বিধান-সংবিধানের, তা দারুল কুফর। ব্যতিক্রম হলো গোমরাহ কাদারিয়্যাদের বক্তব্য। তারা বলে, যে ভূখণ্ডে পাপিষ্ঠদের প্রাধান্য, কাফির বা মুসলিমদের নয়, তা দারুল কুফর নয়, দারুল ইসলামও নয়; তা হলো দারুল ফিস্*ক। এ বক্তব্যের ভিত্তি হলো, তাদের সেই মূলনীতি— 'মানযিলাতুন বাইনাল মানযিলাতাইন' (ইসলাম এবং কুফরের মাঝে আরেকটি স্তর)। আমাদের দলিল ইমানের অধ্যায়ে বিগত হয়েছে। শরিয়তের মুকাল্লাফ যারা তাদের তো এ কয়েকটি অবস্থাই হতে পারে—

১. কাফির

২. মুমিন— পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী বা ত্রুটিপূর্ণ ইমানের অধিকারী।

তো সকল মানুষ হয়তো মুমিন, কিংবা কাফির। এমন তো হতে পারে না যে, কোনো শরিয়তের মুকাল্লাফ মানুষ মুমিনও নয়, আবার কাফিরও নয়। (উল্লেখ্য, মুনাফিক আলাদা কিছু নয়। তারা তো কাফিরদের সর্বনিম্ন শ্রেণি। চিরস্থায়ী জাহান্নামী। জাহান্নামের সবচে নিম্নসতরে হবে তাদের বসবাস।) তেমনিভাবে 'দার'ও দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হবে না। হয়তো তা দারুল কুফর হবে, কিংবা তা দারুল ইসলাম হবে। {আলমু'তামাদ ফি উসুলিদ দীন, আবু ইয়া'লাঃ ২৭৬}

আল্লামা ইবনু মুফলিহ রহ. বলতেন, "প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত, তা দারুল ইসলাম। আর যদি কোনো ভূখণ্ডে কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তা দারুল কুফর। এদু'য়ের বাইরে আর কোনো দার নেই।'' {আরো দেখুন— আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ইবনুল কায়্যিমঃ ১/৪৭৫-৪৭৬}

হাঁ, তৃতীয় আরেকটি 'দারে'র অস্তিত্বের বর্ণনা আমরা পাই ইউরোপীয় ও প্রাচ্যবিদ গবেষকদের কাছে। তারা এটাকে 'দারুল আহ্*দ' নামে, কেউ 'দারুল আমান' নামে, কেউ 'দারুল মুওয়াদায়াহ' নামে উল্লেখ করেন। {দেখুন— ইকতিশাফুল মুসলিমিন লি উরুব্বা, বার্নাড লুইসঃ ৬৯; আততাকসিমুল ইসলামি লিল মা'মুরাহ, ড. মুহিউদ্দিন কাসিম; ৪৯; মানহাজুল ইসলাম ফিল হারব ওয়াস সালাম, ড. উসমান জুমআহ যামিরিয়্যাহঃ ৫৮}

সর্বপ্রথম আমরা এই বন্টন দেখতে পাই 'দায়িরাতুল মা'আরিফ আলইসলামিয়া'র (Islamic Encyclopedia) লেখকদের কাছে। এরপর বিদগ্ধ গবেষকদের মধ্যে এই আলোচনার সূত্রপাত করেন ড. নজিব (আশশারুদ দুওয়ালি ফিল ইসলামঃ ৫০)। তারপর একে আরো শক্তিশালী করেন শায়খ আবু যুহরা (আলআলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহঃ ৫৫; নাযরিয়্যাতুল হারবঃ ১৪)। একই চিন্তা লালন করেন ড. ওয়াহবা যুহায়লি, ড. মুহাম্মাদ দাসুকি, ড. আব্দুল হামিদ আলহাজ, ড. মাজিদ, উস্তাদ আল্লাল আলফাসি আলমাগরিবি

{দেখুন— আসারুল হারবঃ ১৭৫-১৭৬; আলআলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহঃ ১০৭-১০৮; আলইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ওয়া আসারুহু ফিল ফিকহঃ ৩৩০; আননুযুমুদ দুওয়ালিয়্যাহঃ ১৮২-১৮৩; আলকানুনুদ দুওয়ালি আলইসলামিঃ ২২-২৩; মাকাসিদুশ শারিয়াহ ওয়া মাকারিমুহাঃ ২২৯}

আমাদের ইমামগণের মতে দারুল হারব দুই প্রকার।

১. এমন দারুল হারব, যার সঙ্গে মুসলমানদের কোনো চুক্তি নেই। এটা হলো দারুল খাওফ— অর্থাৎ, ভয়ের শহর। যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয়।

২. এমন দারুল হারব, যার অধিবাসীরা মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের নিরাপত্তা চুক্তি করেছে। এটাকে আমরা দারুল আমান, দারুল আহদ বা দারুল মুওয়াদাআহ

বলতে পারি। এই রাষ্ট্র যদিও ইসলামি রাষ্ট্র নয়, কিন্তু সেখানে চুক্তির কারণে মুসলমানরা নিরাপদ। যেমন ছিলো রাসুলের যুগে নাজাশির রাষ্ট্র হাবাশাহ (ইথিওপিয়া)।

দ্বিতীয় প্রকারটিকেও আমাদের মহান ইমামগণ দারুল হারবের মাঝেই গণ্য করেছেন। তারা এটাকে স্বতন্ত্র কোনো 'দার' নয়, বরং দারুল হারব গণ্য করেই এর ভিত্তিতে অনেক মাসআলা এবং ফতোয়া প্রদান করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, "দারুল হারবের দেশসমূহের কোনো দেশের অধিবাসীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তবদ্ধ হয়, তারা প্রতি বছর মুসলমানদের খারাজ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য কোনো কর প্রদান কর প্রদান করবে এই শর্তে যে, মুসলমানরা তাদের ওপর ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করবে না, এবং তারা যিম্মিও হয়ে যাবে না— এরপর তাদের কেউ এই চুক্তির ভিত্তিতে অনেক ধনসম্পদ নিয়ে দারুল ইসলামের উদ্দেশে বের হয়, তাহলে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।"

ইমাম সারাখসি রহ. এর ইল্লত (Cause) বর্ণনা করেন, "যে লোকটি দারুল ইসলামের উদ্দেশে বেরিয়েছে, সে তার অবস্থানুযায়ী হারবি, যিম্মি নয়, তবে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। কেননা চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের ওপর ইসলামের বিধান প্রয়োগ হয় না। ... এই চুক্তির দ্বারা তাদের দেশ দারুল ইসলাম হয়ে যায়নি, যেহেতু সেখানে ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর করা হয়নি। তা দারুল হারবই থেকে যায়।" {আসসিয়ারুল কাবির মা'আ শরহিস সারাখসিঃ ৫/২১৫৭, ২১৬৫}

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আরো বলেন, "চুক্তিকারীদের কোনো নাগরিক তাদের দেশে (দারুল মুওয়াদাআহ-তে) অপর কোনো নাগরিককে হত্যা করলে তার ওপর কিসাস কার্যকর হবে না। আর যদি আমাদের রাষ্ট্রে (দারুল ইসলামে) কোনো মুসতামিন অপর কোনো মুসতামিনকে হত্যা করে, তবে তার ওপর কিসাস অপরিহার্য হবে।"

ইমাম সারাখসি রহ. এর ইল্লত (Cause) বর্ণনা করেন, "কেননা চুক্তিকারীরা ইসলামের বিধিবিধান নিজেদের ওপর অপরিহার্য করে নেয়নি। কেননা তারা চুক্তিই করেছে এই মর্মে যে, তাদের ওপর ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর করা হবে না।

তাই তাদের রাষ্ট্র পূর্বের মতো দারুল হারবই থাকবে।" {আসসিয়ারুল কাবির মা'আ শরহিস সারাখসিঃ ৫/১৮৫৭, ১৮৯৩}

তিনি আরো বলেন, "কেননা যখন তারা ইসলামের বিধানের সামনে নতি স্বীকার করেনি, তখন চুক্তি করার দ্বারা চুক্তিকারী হলেও তারা 'হারবি'র কাতার থেকে বেরিয়ে যায়নি। তুমি দেখছো না, কৃত চুক্তির মেয়াদ গত হলেই তো পুনরায় তারা (কাট্টা) হারবিই হয়ে যাবে।" {শরহুস সিয়ারিস সগির, আলমাবসুতের অন্তর্ভুক্তঃ ১০/৮৮-৮৯, ৯৭}

আধুনিক বিশ্লেষকদের বক্তব্যের সারকথা

এবার আমরা বর্তমান বিশ্লেষকগণের বক্তব্যের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবার বক্তব্য উদ্ধৃত করা তো সম্ভব নয়। তাই সূত্রগুলো উল্লেখ করে দিয়েছি। কেউ চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে। তবে সংক্ষেপে তাদের বক্তব্যগুলোর মৌলিক কয়েকটি পয়েন্টের পর্যালোচনা উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো।

১. তৃতীয় কোনো 'দার' এর অস্তিত্ব গণ্য করা মহান ইমাম এবং ফকিহণের ঐকমত্যের বিপরীত। সন্ধিকারীরা ইসলামের বিধিবিধানের অনুগত হলে তাদের রাষ্ট্র ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবেই গণ্য হবে, তাতে মুসলমানের সংখ্যা যতো কমই হোক কিংবা মোটেও তাদের অস্তিত্ব না থাক। আর যদি তারা ইসলামের বিধান-সংবিধান এবং ইসলামি শাসনক্ষমতার সাথে একমত না হয়, তাহলে তা দারুল হারব। এর বাইরে আর কোনো সুরত নেই।

২. কেউ কেউ ইমাম শাফেয়ি এবং তার শাগরেদদের বক্তব্য দ্বারা এই তৃতীয় 'দার'কে প্রমাণ করতে চান। ইমাম শাফেয়ি তো এক্ষেত্রে বড়ই মাজলুম। পূর্বের পর্বে আলোচনা করে এসেছি, একশ্রেণির অথর্ব ইমাম শাফেয়ির বক্তব্য বিকৃত করে পুরো দুনিয়াকে এক 'দার' হিসেবে অভিহিত করতে চায়। তারা দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের বিভক্তিকেই স্বীকার করে না। এই আরেক শ্রেণি তার বক্তব্যকে অপাত্রে প্রয়োগ করে, পুরো দুনিয়াকে তিন 'দার' বানাতে চায়। তবে মজার বিষয়, তারা তার বক্তব্যকে হুবহু উদ্ধৃত করেন না। এই অভিমতকে শুধু তার দিকে নিসবত করেই ক্ষান্ত হন। আল্লাহ জানেন, সামনে কে এসে কীভাবে আরো বিকৃত করে।

৩. কেউ কেউ তো ইমাম মুহাম্মাদ এবং কাজি আবু ইয়া'লা রহ. এর দিকেও এই সারহীন অভিমতকে নিসবত করে। ওপরে তো আমরা তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেই এসেছি। কাজি আবু ইয়া'লা রহ. তো পরিষ্কার ভাষায় তৃতীয় 'দারে'র অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন।

৪. কেউ ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি ফতোয়াকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। আমাদের এই সিরিজের তৃতীয় পর্বে আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি।

৫. কেউ মাওয়ারদি রহ. এর একটি বক্তব্য থেকে ভুল বুঝে বা অপাত্রে প্রয়োগ করেও এই মাকসাদ হাসিল করেছেন। তবে এই তৃতীয় 'দারে'র অস্তিত্বের প্রথম ঘোষক প্রাচ্যবিদ মহোদয়গণ এতোটা বে-ইনসাফ হননি। তারা পর্যন্ত মাওয়ারদি রহ. এর বক্তব্য দ্বারা যে তৃতীয় কোনো 'দারে'র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না— স্বীকার করেছেন।

৬. হাবাশাকে তৃতীয় 'দারে'র পক্ষে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা ইলমি অগভীরতার প্রমাণ বহন করে। কেননা হাবাশায় ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত ছিলো না, তাই তা দারুল হারব। হাঁ, সেখানে মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এর কারণে তা দারুল হারব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা ওপরে বলে এসেছি, দারুল হারব দু'ধরনের— দারুল খাওফ (যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয়) এবং দারুল আহদ, দারুল মুওয়াদাআহ বা দারুল আমান (যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ)।

'দারে'র ভিন্নতার কারণে আহকামের ভিন্নতা

'দারে'র ভিন্নতার কারণে কি আহকামে ভিন্নতা আসে? দারুল ইসলামের বিধান এবং দারুল হারবের বিধান কি অভিন্ন থাকে না ভিন্ন হয়?

এ মাসআলার সমাধানে ইমামগণের দু'ধরনের অভিমত।

১. ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মতে 'দারে'র ভিন্নতা আহকামের ভিন্নতা অপরিহার্য করে। কেননা বাস্তবে কিংবা হুকুমের বিচারে (এর ব্যাখ্যা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ) 'দার' ভিন্ন হওয়াটা মৃত্যুর সমপর্যায়ের। আর মৃত্যু মালিকানা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তেমনি 'দারে'র ভিন্নতাও মালিকানা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কেননা মালিকানা সাব্যস্ত হয় অধিকৃত বস্তুর ওপর কবজার দ্বারা। আর

বাস্তবে কিংবা হুকুমের বিচারে 'দার' ভিন্ন ভিন্ন হওয়া কবজার যোগ্যতা নষ্ট করে দেয়। বাস্তবে কবজা নষ্ট হয় মালিকের অধিকার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। আর হুকুমের বিচারে কবজা নষ্ট হয় ব্যক্তির হাত থেকে হস্তক্ষেপের অধিকার বিনষ্ট হওয়ার মাধ্যমে।

২. ইমাম শাফেয়িসহ অধিকাংশ ইমামের মতে 'দারে'র ভিন্নতা আহকামে ভিন্নতা আনে না। কেননা 'দার' আর জায়গার তো কোনো আহকাম নেই। আহকাম তো সব আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত। আর ইসলামের দাওয়াত কাফিরদের ওপরও ব্যাপক, তারা তাদের দেশে থাক কিংবা অন্য কোথাও। {তাখরিজুল ফুরু' আলাল উসুল, যানজানি— ২৭৭-২৮৭; তাসিসুন নাযার, দাবুসি— ৭৯-৮০; বাদায়িউস সানায়ি'— ৯/৪৩৭৬}

এই ব্যাপক উসুলের আলোকে অগণিত শাখা এবং অসংখ্য মাসায়িল বের হয়। কিছু আহকাম পররাষ্ট্রনীতির সাথে সম্পৃক্ত আর কিছু স্বরাষ্ট্রনীতির সাথে সম্পৃক্ত। আমরা এখানে একটি ব্যাপক মূলনীতি এবং কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করবো, যার বিধান 'দারে'র ভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়।

দারুল হারবে অবস্থানরত হারবিদের সাথে মুসলমানদের আচরণ-রীতি

দারুল হারবে 'আমান' (নিরাপত্তা) নিয়ে প্রবেশকারী মুসলমানের আচরণ-রীতি এবং মুআমালা কেমন হবে সে সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. একটি ব্যাপক মূলনীতি বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "কোনো মুসলমান ব্যক্তি 'আমান' নিয়ে যখন দারুল হারবে প্রবেশ করে, তখন তার জন্য এই নিরাপত্তাচুক্তি লঙ্ঘন করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং তাদেরকে ধোঁকা দেয়া বৈধ নয়। তার ওপর অপরিহার্য তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা, যেমনিভাবে তারা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে। আর সে যখন তাদের হাতে বন্দি হিসেবে থাকবে, তখন সে 'আমান' গ্রহণকারী নয়। তার অধিকার আছে, সে যতো পারে তাদেরকে হত্যা করবে, যতোটুকু পারে তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিবে।" {কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়— ১৩৮; আসসিয়ারুল কাবির— ৪/১৪৮৬}

হানাফি ফকিহগণ ইমাম মুহাম্মাদের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন— যখন কোনো মুসলমান ব্যবসা বা অন্য কোনো কাজে 'আমান' নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে, তখন তার জন্য তাদের জান মাল বা সম্মানের কোনো ক্ষতি করা বৈধ নয়। কেননা যখন সে 'আমান' নিয়ে প্রবেশ করেছে, তখন তার এই 'আমানে'র মাঝেই এ বিষয়টা রয়েছে যে, সে তাদেরকে ধোঁকা দিবে না, তাদের কোনোপ্রকার ক্ষতি করবে না, তাদের মনোতুষ্টি ছাড়া তাদের মালিকানাধীন কোনোসম্পদ ভোগদখল করবে না। যখন সে এর ব্যতিক্রম করলো, তখন তো নিরাপত্তাচুক্তি লঙ্ঘন এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ হিসেবে ধর্তব্য হবে। এ তো সুস্পষ্ট হারাম। অসংখ্য নসে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যদি সে তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে আনে, এবং দারুল ইসলামে তা নিয়ে প্রবেশ করে তাহলে জেনেশুনে কোনো মুসলমানের জন্য তার থেকে সেই বস্তু কেনা জায়িয নয় (মাকরুহে তাহরিমি)। কেননা সে নিষিদ্ধ পন্থায় এই বস্তুর মালিকানা লাভ করেছে। এটা খাবিস উপার্জন। সদকা করার দ্বারা নিজের মালিকানা থেকে বের করে দেয়া ওয়াজিব।

তবে এই মূলনীতির থেকে ব্যতিক্রম ক্ষেত্রও রয়েছে, যখন সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, হারবি হত্যা করা জায়িয হয়ে যায়, তবে সেক্ষেত্রেও সম্ভ্রমহানি করা যাবে না। এটা তখন, যখন কাফিরদের সরকার তাকে ধোঁকা দিয়ে বন্দি করে অথবা তার অর্থসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, অথবা রাষ্ট্রের প্রজাদের কেউ তাকে ধোঁকা দেয়, কিন্তু সরকারপ্রধান অপরাধীকে বারণ করে না, তাহলে এটাও সরকারের সম্মতিতে সংঘটিত হয়েছে বলেই ধর্তব্য হবে, তখন এই মুসলমানের জন্য হারবিদেরকে হত্যা করা, তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়া বৈধ হবে। {দেখুন— আলমাবসুত— ১০/৬৫, ৯৬; শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১১৫-১১৬; আররাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ি— ১২৬; আলহিদায়াহ ওয়া শুরুহুহা— ৪/৩৪৭-৩৪৮; মাজমাউউল আনহুর এবং আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৫৫; আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া— ২/২৩২; তাবয়িনুল হাকায়িক— ৩/২৬৬; আলফুরুক, কারাবিসি— ১/৩২৫, ৩২৭; রাদ্দুল মুহতার— ৪/১৬৬; আললুবাব শরহুল কিতাব— ৩/১৩৪-১৩৫; ইখতিলাফুল ফুকাহা, তাবারি— ৬৩, ১৯২-১৯৪}

প্রসঙ্গঃ দারুল হারবে সুদের লেনদেন

পূর্বের পোস্টে আমরা 'দারে'র ভিন্নতার কারণে আহকামের ভিন্নতা এবং দারুল হারবে হারবিদের সাথে মুসলমানদের আচরণরীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং সেখানে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বর্ণিত ব্যাপক মূলনীতি উদ্ধৃত করেছি। তার আলোকে আমরা ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করবো। আজ আলোচ্যবিষয়—

"দারুল হারবে সুদের লেনদেন"।

(উল্লেখ্য, বাংলা সুদের থেকে আরবি 'রিবা' শব্দটি অনেক ব্যাপক। এখানে বোঝার সুবিধার্থে সুদ শব্দ উল্লেখ করা হলো। এদুয়ের মাঝে পার্থক্য জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট স্থানে দ্রষ্টব্য।)

'দারে'র ভিন্নতার কারণে আহকামে ভিন্নতা আসে কি না সেই ইখতিলাফের ভিত্তিতে এই মাসআলায় ইমামগণের দু'ধরনের অভিমত রয়েছে। তবে কিছু বিষয়ে তাদের সকলের ঐকমত্যও রয়েছে। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমরা উভয় ফরিকের ঐকমত্যের ক্ষেত্রগুলোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করি।

ক. সকল ইমাম ও ফকিহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত— দারুল ইসলামে মুসলমানের জন্য সুদি লেনদেন করা বৈধ নয়, এবং এমন স্থানেও তা বৈধ নয়, যেখানে মুসলমানদের বিধিবিধান চলে, যেমন দারুল হারবে অবস্থানরত মুসলিম সেনাদল। চাই উক্ত লেনদেন কোনো মুসলমানের সাথে করা হোক, কিংবা কোনো যিম্মি বা মুসতামিন (দারুল ইসলামে অবস্থানরত নিরাপত্তাগ্রহণকারী হারবি) এর সাথে। কেননা কোনো মুসলমানের জন্য অমুসলিমদের সাথে শুধু সে লেনদেনগুলোই বৈধ, যা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বৈধ।

খ. তেমনি সকল ইমাম ও ফকিহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত— দারুল হারবে কোনো মুসলমানের জন্য হারবিকে সুদ দেয়া বৈধ নয়, যেমনিভাবে দারুল ইসলামে তা বৈধ নয়। আর দারুল হারবে অবস্থানরত মুসলমানদের সাথে তার আচরণবিধি ঠিক তেমনই হবে, যেমন দারুল ইসলামে অবস্থানরত মুসলমানদের সাথে হয়। কেননা মুসলমান যেখানেই থাক, সে অবশ্যই ইসলামের বিধিবিধান মান্যকারী।

এরপর তৃতীয় বিষয়টিতে এসে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য হয়ে গেছে। কোনো মুসলমান যদি 'আমান' নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে, এরপর হারবিদের সাথে

সুদি চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য কোনো লেনদেন করে আর সে হারবিদের থেকে সুদ গ্রহণ করে— এ সুরতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম আহমদের একটি বর্ণনা (শরহুয যারকাশি দ্রষ্টব্য, ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ঝোঁকও এই বর্ণনার দিকে অনুমিত হয়।) এবং আরো কিছু সালাফের মতে, যেমন ইবরাহিম নাখয়ি, ইবনুল মাজিশুন এবং অন্য আরো ক'জনের মতে তা বৈধ হবে।

আর অধিকাংশ ইমাম ও ফকিহের মতে তা বৈধ নয়। নিচে আমরা ইমামগণের বক্তব্য এবং উভয় ফরিকের মৌলিক দলিলগুলোর প্রতি আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, "মুসলমান যখন 'আমান' নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে, তখন তার জন্য হারবিদের মনোতুষ্টির সাথে তাদের সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ— তা যে-কোনো পন্থায়ই হোক।" {আসসিয়ারুল কাবির— ৪/১৪১০, ১৪৮৬; কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়— ১৮১}

ইমাম সারাখসি রহ. এর ইল্লত (Cause) বর্ণনা করেন, "কেননা 'আমান' নিয়ে প্রবেশ করার দ্বারাই তো আর হারবিদের অর্থসম্পদ সংরক্ষিত (معصوم) হয়ে যায় না। তবে সে 'আমান' চুক্তির দ্বারা এ অঙ্গীকার করে নিয়েছে যে, সে খেয়ানত করবে না। এজন্য খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকা তার ওপর অপরিহার্য। যে-কোনো পন্থায় সে তাদের মনোতুষ্ট করে অর্থসম্পদ গ্রহণ করলে সে তো বৈধ পন্থায় তা গ্রহণ করেছে বলেই বিবেচিত হবে। সে কোনো ধোঁকা-প্রতারণার তো আশ্রয় নেইনি। এজন্য তার জন্য সেই সম্পদ পবিত্র বলে বিবেচিত হবে। বন্দি এবং 'আমান'গ্রহণকারী উভয়ের এক্ষেত্রে একই বিধান। এমনকি সে যদি এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম গ্রহণ করে, কিংবা অর্থের বিনিময়ে মৃত বস্তু বিক্রি করে, অথবা কিমার-জুয়ার পন্থায় তাদের থেকে অর্থসম্পদ গ্রহণ করে— এ সবই তার জন্য বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

এটা পুরোটাই ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত।

ইমাম সুফয়ান সাওরি রহ. বলেন, বন্দি মুসলিমের জন্য তা তো বৈধ হবে; কিন্তু 'আমান'গ্রহণকারী মুসলিমের জন্য তা বৈধ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এরও একই মত।

তাদের জবাবে আমরা বলবো, বন্দির থেকে 'আমান'গ্রহণকারীর বিধানের ভিন্নতা তো শুধু হারবিদের মনোতুষ্টি ছাড়ার অর্থসম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে। মনোতুষ্টির সাথে অর্থসম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে 'আমান'গ্রহণকারীর বিধান বন্দির মতোই। কেননা তার ওপর শুধু এতোটুকু অপরিহার্য, সে তাদেরকে ধোঁকা দিবে না। আর মনোতুষ্টির সাথে অর্থসম্পদ গ্রহণের মাঝে তো কোনো ধোঁকা নেই। {শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১৪১০-১৪১১}

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আরো বলেন, "আমানগ্রহণকারী যদি তাদের কাছে এক বছর মেয়াদে দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করে, এরপর আমাদের রাষ্ট্রে চলে আসে, তারপর পুনরায় তাদের কাছে ফিরে যায় অথবা সেই বছর চলে এসে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গিয়ে দিরহাম গ্রহণ করে, তাহলে কোনোই সমস্যা নেই। কেননা মুসলমানদের বিধিবিধান ওখানে চলে না। {আসসিয়ারুল কাবির— ৪/১৪৮৬; কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়— ১৮১; শরহু মুশকিলিল আসার, তাহাবি— ৮/২৪৮}

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, কোনো মুসলমান যদি 'আমান' নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে, এরপর তাদের কাছে দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা মুসলমানদের বিধিবিধান তাদের ওপর প্রয়োগ হবে না। তাই তাদের সন্তুষ্টির সাথে যে-কোনো উপায়ে তাদের সম্পদ গ্রহণ করা, তা বৈধ। {কিতাবুর রদ আলা সিয়ারিল আওযায়ি; কিতাবুর রাদ আলা মুহাম্মাদ, কিতাবুল উম— ৭/৩৭৮-৩৭৯}

এবার আমরা তাদের দলিলগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি। এই মাসআলার ভিত্তি হাদিস আসার এবং কিয়াসের ওপর। ধারাবাহিকভাবে সবগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর দলিল

১ম দলিল—

ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غيرربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, শোনো, জাহেলি যুগের সুদ বিলুপ্ত। তোমরা মূলধন পাবে। তোমরা জুলুম করবে না। তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না। তবে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদের কথা ভিন্ন। কেননা তা পুরোটাই বিলুপ্ত। {সহিহ মুসলিম— ১২১৮ (১৪৭); সুনানে ইবনে মাজাহ— ৩০৭৪; সুনানে তিরমিযি— ৩০৮৭। ইমাম তিরমিযি বলেন, এই হাদিসটি হাসান সহিহ।}

আব্বাস রা. এর ইসলামগ্রহণের সময় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ বলেন, তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলামগ্রহণ করেছেন। আর কারো বক্তব্য হলো, বদরযুদ্ধে তিনি বন্দি হয়েছেন। এরপর ইসলামগ্রহণ করেছেন। অনন্তর রাসুলুল্লাহ সা. সকলের অনুমতি নিয়ে তাকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তো ইসলামগ্রহণের পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন। মক্কা বিজয় পর্যন্ত সেখানে তিনি সুদি লেনদেন করতেন। অথচ সুদ হারাম হওয়ার বিধান মক্কা বিজয়ের অনেক আগেই নাযিল হয়েছে। খায়বারের দিন রাসুলুল্লাহ সা. দুই সাদ রা. (সাদ ইবনে আবি ওয়াককাস এবং সাদ ইবনে উবাদা) এর উদ্দেশ্যে বলেছেন—

أربيتما فردا

তোমরা সুদি লেনদেন করেছো। তাই ফিরিয়ে দাও। {মুয়াত্তা মালিক— ২/৬৩২; আততামহিদ— ২৪/১০৬; শরহুয যারকানি— ৩/২৭৬। উল্লেখ্য, কারো কারো বর্ণনায় দিনটিকে হুনায়নের দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— গাওয়ামিযুল আসমা, ইবনে বাশকুওয়াল— ২০২}

তাছাড়া পবিত্র কোরআনের আয়াত—

يا أيُّها الَّذين آمنوا لا تأكلوا الرِّبا أضعافاً مُضاعفة

হে ইমানদারগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না। {সুরা আলে ইমরান— ১৩০}

এই আয়াত মক্কা বিজয়ের অনেক পূর্বে উহুদ যুদ্ধের সময়ে নাযিল হয়। এরপরও মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ সা. আব্বাস রা. এর লেনদেনগুলোকে বাতিল ঘোষণা করেননি, শুধু সেগুলো ছাড়া, যার কবজা পূর্ণ হয়নি— এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দারুল হারবে মুসলমান এবং হারবির মাঝে সুদি লেনদেন বৈধ। আর কবজা করার পূর্বেই সেই ভূমি দারুল ইসলাম হয়ে গেলে চুক্তি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। {শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১৪৮৭-১৪৮৮}

ইবনে আব্বাস রা. এর সুদ বিলুপ্তির বর্ণনার পরে ইমাম সারাখসি রহ. বলেন, "এ বিধান দেয়া হয়েছে, কেননা ইবনে আব্বাস রা. ইসলামগ্রহণ করার পরে মক্কায় ফিরে এসেছেন আর তিনি সুদি লেনদেন করতেন। তিনি তার কাজকর্মের কথা রাসুলুল্লাহ সা. থেকে গোপন রাখতেন না। এরপরও রাসুলুল্লাহ সা. যখন তাকে তা থেকে বারণ করেননি, এটাই প্রমাণ করে যে, তা বৈধ। এর মধ্য থেকে মক্কা বিজয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত যা কবজা করা হয়নি রাসুলুল্লাহ সা. সেগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। আমাদের অভিমতও এটাই। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটও তাই—

وذَرُوا ما بَقِيَ منَ الرِّبا

তোমরা বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। {সুরা বাকারাহ— ২৭৮} । {দেখুন— আলমাবসুত— ১৪/৫৭}

ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ. বলেন, "আব্বাস রা. এর ইসলামগ্রহণ খায়বার বিজয়ের পূর্বেই হয়েছিলো, যেমনতা হাজ্জাজ ইবনে ইলাত সুলামির হাদিস (দেখুন— শরহু মুশকিলিল আসার— ৮/২৪২-২৪৪; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক— ৫/৪৬৬-৪৬৯; মুসনাদে আহমাদ— ৩/১৩৮-১৩৯; বায়হাকি— ৯/১৫১) প্রমাণ করে। সে সময়ে দারুল ইসলামে মুসলমানদের ওপর সুদ হারাম ছিলো। ... এরপর বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

ربا الجاهلية موضوع

"জাহেলি যুগের সুদ বিলুপ্ত"— এই বাক্যের মাঝেই প্রমাণ রয়েছে যে, মক্কা যেহেতু দারুল হারব ছিলো, তাই বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে সুদ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কেননা মক্কা থেকে জাহিলিয়্যাত দূর হয়েছে তার বিজয়ের দ্বারা। রাসুলুল্লাহ সা. এর ওই বাক্যটিতে প্রমাণ রয়েছে যে, আব্বাস রা. এর সুদও কায়িম ছিলো অনন্তর

রাসুলুল্লাহ সা. তা বিলুপ্ত করেছেন। কেননা তা-ই শুধু বিলুপ্ত করা যায়, যা কায়িম থাকে। যা পূর্বেই রহিত হয়ে আছে, তা বিলুপ্ত করা যায় না। খায়বার বিজয় হয়েছে সপ্তম হিজরিতে। মক্কা বিজয় হয়েছে অষ্টম হিজরিতে। আর বিদায় হজ হয়েছে দশম হিজরিতে।

এতেই প্রমাণ রয়েছে যে, মক্কা বিজয় পর্যন্ত আব্বাস রা. এর সুদি লেনদেন অব্যাহত ছিলো। অথচ তিনি তো মুসলিম আগেই হয়েছেন। এর মাঝে এই প্রমাণও রয়ে গেছে যে, মক্কা দারুল হারব হওয়ায় সেখানে মুসলমান এবং মুশরিকদের মধ্যে সুদি লেনদেন হালাল ছিলো। অথচ তখন দারুল ইসলামে তা মুসলমানদের মাঝে হারাম ছিলো। {শরহু মুশকিলিল আসার, তাহাবি— ৮/৪৪২-৪৫২; মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা লিত তাহাবি, জাসসাস— ৩/৪৯২; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ২/৯-১০; আহকামুল কোরআন, জাসসাস— ১/৩৭১}

২য় দলিল—

মাকহুল রহ. রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন—

لا ربا بين أهل الحرب

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, আমার ধারণা, এরপরের শব্দটা এরূপ—

و أهل الإسلام

ইমাম সারাখসি রহ. এভাবে বর্ণনা করেছেন—

لا ربا بين المسلمين و بين أهل الحرب في دار الحرب

অর্থাৎ— দারুল হারবে মুসলমান এবং হারবিদের মাঝে কোনো সুদ নেই। {আররাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ি— ৯৭; কিতাবুল উম— ৭/৩২৬; মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, বায়হাকি— ১৩/২৭৬; নাসবুর রায়াহ— ৪/৪৪; তাকমিলাতুল মাজমু শরহুল মুহাযযাব, নববি— ১১/১৫৯; ফাতহুল কাদির— ৫/৩০০}

ইমাম সারাখসি রহ. বলেন, "এই হাদিসটি যদিও মুরসাল, তবে মাকহুল রহ. ফকিহ এবং সিকাহ। এমন ব্যক্তিত্ব থেকে মুরসাল গ্রহণীয়। দারুল হারবে হারবিদের

কাছে দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করার বৈধতার ব্যাপারে এটা ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর দলিল।" {আলমাবসুত, সারাখসি— ১৪/৫৬}

৩য় দলিল—

বনু কাইনুকার হাদিস। কেননা নবি সা. যখন তাদেরকে নির্বাসিত করেছেন, তখন তারা বললো, আমাদের কিছু ঋণ রয়েছে, যা পরিশোধের মেয়াদ এখনও আসেনি। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, নগদ দিয়ে দাও এবং (এর কারণে কিছু) কম দাও। বনু নাযির গোত্রকে নির্বাসন করার সময়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। {আসসিয়ারুল কাবির— ৪/১৪১২}

সারাখসি রহ. বলেন, এটা তো সুবিদিত যে, এ ধরনের লেনদেন মুসলমানদের মাঝে বৈধ নয়। কেননা যার যিম্মায় নির্দিষ্ট মেয়াদে অন্য কারো ঋণ থাকে, এরপর সে নগদ দেয়ার শর্তে তা কিছুটা কমিয়ে দেয়, তাহলে এটা বৈধ নয়। উমর, যায়দ বিন সাবিত এবং ইবনে উমর রা. তা অপছন্দ করেছেন। নবিজি সা. তাদের ব্যাপারে এটার বৈধতা দিয়েছেন, কেননা তারা সেই সময়ে হারবি ছিলো। এজন্য তাদেরকে নির্বাসিত করেছেন। তো আমরা জানতে পারলাম, মুসলমান এবং হারবির মাঝে এমন সব বিষয় বৈধ, যা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বৈধ নয়। {শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১৪১২}

৪র্থ দলিল— কিয়াস

দারুল হারবে হারবিদের সম্পদ তো মৌলিকভাবে বৈধ। তা গ্রহণ করার অর্থ হলো অমালিকানাধীন মুবাহ সম্পদের কবজা নেয়া। 'আমান' গ্রহণের মাধ্যমে তা সংরক্ষিত সম্পদ হয়ে যায়নি। তবে 'আমান'গ্রহণকারী মুসলিম দারুল হারবে পবেশের সময়ে অঙ্গীকার করে নিয়েছে যে, সে তাদেরকে ধোঁকা দিবে না, তাদের মনোতুষ্টি ছাড়া তাদের অর্থসম্পদ ভোগদখল করবে না। এখন তার জন্য এ বিষয়গুলো নিষিদ্ধ, যাতে সে ধোঁকাবাজ প্রতীয়মান না হয়। হারবি যখন স্বেচ্ছায় তার অর্থ প্রদান করলো, তখন নিষিদ্ধতার কারণ দূর হয়ে গেলো। মৌলিক বৈধতার কারণেই এক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে, সুদ হালাল— এ বিবেচনায় নয়। {আলইনায়াহ— ৫/৩০০; আলবাহরুর রায়িক— ৬/১৪৭; তাবয়িনুল

হাকায়িক— ৪/৯৭; বাদায়িউস সানায়ি'— ৯/৪৩৭৮; মাজমাউল আনহুর এবং আদদুররুল মুনতাকা— ২/৮৯-৯০}

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসি রহ. বলেন, "তারা বলছেন, এ তো মনোতুষ্টির সাথে কাফিরের সম্পদ গ্রহণ। এর অর্থ— তাদের অর্থসম্পদ মৌলিক বৈধতার ওপরেই আছে। সে নিজেই অঙ্গীকার করে নিয়েছে যে, তাদের সাথে খেয়ানত করবে না। এ সকল উপায়ে সে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে নিচ্ছে ধোঁকা-প্রতারণা থেকে দূরে থাকার জন্য। এরপর সে তাদের সম্পদ গ্রহণ করছে মৌলিক বৈধতার কারণেই, (নিষিদ্ধ) চুক্তির কারণে নয়। এর মাধ্যমেই হুকুম দারুল ইসলামে অবস্থানকারী আমানগ্রহণকারী কাফিরদের থেকে ভিন্ন হয়ে গেলো। কেননা 'আমানে'র মাধ্যমে তাদের অর্থস্মপদ সংরক্ষিত হয়ে গেছে। বৈধতার বিচারে তা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। {আলমাবসুত— ১০/৯৫; আলফুরুক,কারাবিসি— ১/৩২৬-৩২৭; মাজমাউল আনহুর— ২/৯০; ফাতাওয়া শামি— ৫/১৮৬}

এই হলো তাদের দলিলের প্রতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত। {আরো দেখুন— শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১৪৮৬; শরহু মুশকিলিল আসার, তাহাবি— ৮/২৪৮-২৪৯; মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা— ৩/৪৯১; তাবয়িনুল হাকায়িক— ৪/৯৭; ফাতহুল কাদির এবং আলইনায়াহ— ৫/৩০০; আলবাহরুর রায়িক— ৬/১৪৭; মাজমাউল আনহুর— ২/৯০; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত, ইবনে রুশদ— ২/৯-১০; আলমুবদি' শরহুল মুকনি'— ৪/১৫৭; আলইনসাফ— ৫/৫৩; আহকামুল কোরআন, ইবনুল আরাবি— ১/৫১৬; ইখতিলাফুল ফুকাহা, তাবারি— ৫৯}

জমহুরের অভিমত

অধিকাংশ ইমাম ও ফকিহ— আবু ইউসুফ, হাসান ইবনে যিয়াদ, শাফেয়ি, মালিক, আওযায়ি, লাইস ইবনে সা'দ, আবু সাওর, আহমদ ইবনে হাম্বলের এক বর্ণনা, ইসহাক এবং অন্যান্যদের অভিমত হলো, মুসলমানের জন্য দারুল হারবে হারবিদের থেকে সুদ গ্রহণ করা জায়িয নয়। {দেখুন— প্রাগুক্ত এবং আওরাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ি, ইমাম আবু ইউসুফ— ৯৬-৯৭; কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়— ১৮০-১৮১; কিতাবুল উম, ইমাম শাফেয়ি— ৪/১৬২-১৬৫,

১৮১-১৮২, ৭/৩২৬; তাকমিলাতুল মাজমু'— ১১/১৫৮-১৫৯; রাওযাতুত তালিবিন— ৩/৩৯৫; আলমুগনি, ইবনে কুদামা— ৪/১৭৬-১৭৭, ১০/৫০৭; কাশশাফুল কিনা'— ৩/২৫৯; মাতালিবু উলিন নুহা— ৩/১৮৯; আলমুহাল্লা— ৮/৫১৪-৫১৫; আলফুরুক, কারাফি— ৩/২০৭; হাশিয়া ইবনুশ শাত আলাল ফুরুক— ২৩১; ইখতিলাফুল ফুকাহা, তাবারি— ৬০-৬৩; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, বায়হাকি— ১৩/২৭৬}

জমহুরের দলিল

জমহুরের দলিল তো অসংখ্য। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি—

১. পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং অগণিত সহিহ হাদিসে সুদ নিষিদ্ধতার ব্যাপকতা। এসব তো কোনো জায়গা বা কোনো কাওমের সাথে বিশেষিত নয়। সর্বদা সব জায়গায় প্রযোজ্য।

২. মুসলমান যেখানেই থাক, শরিয়তের বিধান মান্যকারী থাকবে। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা তার থেকে হক বিদূরিত করবে না, যেমন দারুশ শিরকে অবস্থান সত্ত্বেও তার থেকে নামাজের বিধান রহিত হয় না। আর ইসলামের বিধান হচ্ছে এ ধরনের কারবার-লেনদেন হারাম। যেমনিভাবে তা দারুল ইসলামে আমান নিয়ে বসবাসকারী হারবিদের সঙ্গে বৈধ নয়, তেমনি দারুল হারবের হারবিদের সঙ্গেও তা বৈধ হবে না।

৩. দারুল ইসলামে যা কিছু হারাম, তার সবই দারুল হারবেও হারাম। যেমন— মদপান, ব্যভিচার থেকে শুরু করে সকল অশ্লীলতা, পাপাচার ও গুনাহ।

৪. সুদ যেমনিভাবে মুসলমানদের জন্য হারাম, তেমনি কাফিরদের জন্যও হারাম। কেননা শরিয়তের নিষিদ্ধ এবং হারাম বিধিবিধানের মুখাতাব তারাও। কোরআনের নস দ্বারা কাফিরদের জন্যও সুদ হারাম করা হয়েছে। {এ বিষয়টা বিস্তারিত জানতে দেখুন— উসুলুস সারাখসি— ১/৭২-৭৮; তাইসিরুত তাহরির— ২/১৪৮-১৫০; আততালওয়িহ আলাত তাওযিহ— ১/২১৩-২১৫; তাফসিরে কুরতুবি— ৬/১২, ৪/১৪৬; কাশফুল আসরার— ৪/২৪৩-২৪৫; আলবুরহান, ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি— ১/১০৭-১১০; শরহু তানকিহিল ফুসুল, কারাফি— ১৬৬-১৬৭; আলফুরুক— ১/২১৮; নিহায়াতুস সুল— ১/৩৬৯-৩৮৩;

শরহুল কাওকাবিল মুনির— ১/৫০০-৫০৫; তাখরিজুল ফুরু' আলাল উসুল, যানজানি— ৯৮-১০০; আততামহিদ, ইসনাওয়ি— ১২৬-১৩২; আলকাওয়ায়িদ ওয়াল ফাওয়ায়িদ আলউসুলিয়্যাহ, ইবনুল লাহহাম— ৪৯-৫৭; আলমানসুর ফিল কায়ায়িদ, যারকাশি— ৩/৯৭-১০১; শরহুল মানহাজিল মুনতাখাব ইলা কাওয়ায়িদিল মাযহাব, ইমাম আহমাদ ইবনে আলী মানজুর— ২৬১-২৬৬; উসুলুল ফিকহ, শায়খ আবুন নুর যুহায়র— ১/১৮৪-১৯১}

৫. এই কারবারে গৃহীত সম্পদ ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে গৃহীত সম্পদ। আর ফাসিদ চুক্তি মালিকানার ফায়দা দেয় না।

৬. দারুল হারব দারুল বাগয়ি (বিদ্রোহের শহর) এর মতো, তার ওপর আদিল ইমাম (মুসলমানদের ন্যায়নিষ্ঠ শাসক) এর কোনো কতৃত্ব নেই। আর সর্বসম্মতিক্রমে দারুল বাগয়িতে সুদের লেনদেন বৈধ নয়। তেমনি দারুল হারবেও তা বৈধ হবে না।

জমহুরের পক্ষ থেকে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদের দলিলসমূহের খণ্ডন

১. দারুল হারবে সুদের লেনদেনের বৈধতার পক্ষে আব্বাস রা. এর ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করা অনেক কারণেই যুক্তিযুক্ত নয়। মৌলিক কারণ দুটো।

ক. আব্বাস রা. এর যিম্মায় সুদ ছিলো জাহেলি যুগে, তার ইসলামগ্রহণের পূর্বে। হাদিসের শব্দকে এ অর্থে গ্রহণ করাই যথেষ্ট। তিনি ইসলামগ্রহণের পরও সুদি লেনদেন অব্যাহত রেখেছেন— এমন কোনোই দলিল নেই। আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, ইসলামগ্রহণের পরও তিনি সুদি কায়কারবার করেছেন, তাহলে হতে পারে যে, তিনি তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। তাই নবিজি সা. এই মূলনীতি সেদিন থেকে এই মূলনীতি স্থির করতে চেয়েছেন।

খ. আব্বাস রা. সাধারণভাবেই মুশরিকদের থেকে সুদ নিতেন। তা এজন্য করতেন না যে, দারুল ইসলামে সুদের লেনদেন অবৈধ হলেও দারুল হারবে তা বৈধ। বরং এজন্য যে, তখনও সুদ চূড়ান্তভাবে হারাম হয়নি। সুদের নিষিদ্ধতা কয়েক ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পূর্ণতা লাভ করেছে এই আয়াতের মাধ্যমে—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে তা করো। {সুরা বাকারাহ— ২৭৮}

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সাকিফ গোত্রের ইসলামগ্রহণ এবং সন্ধির পর, যা হিজরি নবম বর্ষে সংঘটিত হয়েছে; অর্থাৎ, বিদায় হজের কিছু আগের ঘটনা। এর আগে সুদের নিষিদ্ধতা অকাট্য এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত ছিলো না। এজন্য আব্বাস রা. মক্কায় মুশরিকদের সাথে সুদি লেনদেন করতেন এবং তাদের থেকে সুদ নিতেন। নবম হিজরিতে অবতীর্ণ সেই আয়াতকেই বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সা. আরো তাকিদ করেছেন তার সেই ঐতিহাসিক বক্তব্যের দ্বারা।

২. মাকহুল রহ. থেকে বর্ণিত হাদিসটি প্রমাণিত নয়। এমনকি অনেক হানাফি আলিমও মন্তব্য করেছেন, এটা একটি মাজহুল (অজ্ঞাত) বর্ণনা, যা কোনো সহিহ, মুসনাদ কিংবা নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া এটি একটি মুরসাল বর্ণনা, যা হাদিস হওয়ার সম্ভাবনা রাখে মাত্র। এই সম্ভাবনাপূর্ণ একটি বর্ণনা সুদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে অকাট্য সব দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না।

আর যদি এই মুরসাল বর্ণনার প্রামাণ্যতা মেনেও নেয়া হয়, তবুও হানাফিদের উসুলেই তা টিকে না। কেননা হানাফিদের উসুল হলো, খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর ওপর যিয়াদাহ করা জায়িয নেই। কেননা তখন এটা নসখ বলে ধর্তব্য হয়। আর খবরে ওয়াহিদ কিতাবুল্লাহ নসখ করার যোগ্যতা রাখে না।

তাছাড়া "লা রিবা" বলার দ্বারা "নাহি"ও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন এই আয়ানে "নাফি" দ্বারা "নাহি" উদ্দেশ্য—

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

আর দলিলের মাঝে একাধিক সম্ভাবনা চলে আসলে তা দলিল হিসেবে উল্লেখ করার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

৩. তাদের কিয়াসও এক্ষেত্রে দলিল হিসেবে টিকে না। কেননা গনিমতের মাধ্যমে তাদের অর্থসম্পদ বৈধ হওয়া তো এটা অপরিহার্য করে না যে, ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমেও তা বৈধ হবে। এজন্যই তো হারবি নারীদেরকে বন্দি করার মাধ্যমে তারা হালাল হয়ে যায়, কিন্তু তাই বলে ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে তা তো বৈধ হয় না। সুদ

ইসলামে নিষিদ্ধ একটি চুক্তি। সুতরাং এর দ্বারা মালিকানা লাভ হতে পারে না। তাই এটা অবৈধ পন্থায় সম্পদ আত্মসাৎ হিসেবে ধর্তব্য হবে, পবিত্র কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে যা সুস্পষ্ট ও অকাট্য হারাম।

৪. বনু নাযিরের ঘটনাকেও দলিল হিসেবে উল্লেখ করা সঙ্গত নয়। কেননা এই বর্ণনাটি এতোই দুর্বল, যা প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করার যোগ্য নয়। তাছাড়া এই দলিলে আরো একাধিক সমস্যার দিক রয়েছে। বিস্তারিত জানতে শাইখুল ইসলাম তাকি উসমানি দা. বা. প্রণীত "বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসিরাহ" দ্রষ্টব্য।

জমহুরের দলিল এবং ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের দলিলের পর্যালোচনা সম্পর্কে জানতে ওপরের সূত্রগুলো দ্রষ্টব্য।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দারুল হারবে হারবিদের থেকে সুদ গ্রহণের মাসআলায় জমহুরের মাযহাব যে শক্তিশালী তা প্রমাণিত হলো। তাছাড়া অনেক হানাফি ফকিহও এই অভিমতই পোষণ করেছেন। যেমন ওপরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর কথা বর্ণিত হয়েছে। বিদগ্ধ হানাফি মুফতিরাও এর আলোকেই ফতোয়া দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। দু-চারজন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের মতকে অবলম্বন করেছেন। এর ভিত্তিতেই মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি দা. বা. ভারতে কাফিরদের থেকে সুদ নেয়া বৈধ, যেহেতু ভারত দারুল হারব— মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মুফতিগণ তার এই ফতোয়া গ্রহণ করেননি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৬৭২

তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলসমূহ

মূল: শায়খ আবু মুহাম্মদ আসিম আলমাকদিসি রহ.

salahuddin aiubi

Senior Member

১২-১১-২০১৮

বইটি নিয়মিত পোষ্ট দেওয়া হবে ইংশাআল্লাহ। সকল ভাইদেরকে পড়ার আহ্বান করছি। বেশ উপকারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

'তাকফীর' তথা কাফের আখ্যাদানে বাড়াবাড়ি থেকে সতর্কীকরণ

التحذير من الغلو في التكفير

সম্মানিত পাঠক! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং আপনাকে উপকারী ইলম অর্জন ও তার উপর আমল করার তাওফিক দান করুন! তাকফীরের মাসআলাটি দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধানের মতই একটি শরয়ী বিধান। তার রয়েছে অনেক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখে অনেক বিধি-বিধান ও মাসায়েল। এটি একটি স্পর্শকাতর মাসআলা। চূড়ান্ত স্পর্শকাতর। এর উপর ভিত্তি করে ইহকালীন ও পরকালীন অনেক ফলাফল আবর্তিত হয়। কিন্তু বহু লোক তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এখানে অনেক পা স্খলিত হয়েছে এবং অনেক বুঝ বিভ্রান্ত হয়েছে।

মূলত: দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সংক্রান্ত মাসআলাসমূহের মধ্যে এটাই সর্বপ্রথম মাসআলা, যার ব্যাপারে উম্মতের মতভেদ হয়েছে। এটা হচ্ছে শাস্তির ধমকি সংক্রান্ত মাসআলা। যেমন ইবনে তাইমিয়া রা: উল্লেখ করেন:

"মনে রাখবেন, কাফের বা ফাসেক আখ্যাদানের মাসআলাসমূহ হল নাম ও বিধান আরোপ সংক্রান্ত এমন মাসআলা, যার সাথে পরকালে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি, জাহান্নামের সতর্কবাণী এবং দুনিয়াতে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, হত্যা, নিরাপত্তা ইত্যাদি

বিধি-বিধান সম্পর্ক রাখে। কারণ আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য জান্নাত রেখেছেন আর কাফেরদের জন্য তা হারাম করেছেন। এটা সর্বসময় এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য সামগ্রীক বিধি-বিধানের অন্তর্ভূক্ত"। (মাজমূউল ফাতাওয়া ১২/২৫১)

উদাহরণত: তাকফীর বিষয়ে ফিকহের কিতাবসমূহ অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, কী পরিমাণ মাসায়েল ও বিধি-বিধান এর সাথে সম্পর্কিত আর এ বিষয়টির গুরুত্ব ও স্পর্শকাতরতাও জানতে পারবে।

* উদাহরণ স্বরূপ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সাথে সম্পর্কিত মাসআলাগুলো দেখুন: সেখানে রয়েছে-

- মুসলিম শাসকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের সাহায্য করা ও তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্পষ্ট কুফর প্রকাশ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয নেই।
- যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামের গণ্ডির ভিতর থাকে এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পিছনে নামায পড়া ও তাদের সঙ্গে মিলে জিহাদ করা শরীয়তে বৈধ; চাই তারা নেককার হউক বা বদকার হউক।
-যে সমস্ত মুসলিমদের অভিভাবক নেই, মুসলিম শাসক তাদের অভিভাবক হবে।

* পক্ষান্তরে কাফের শাসকের হাতে বাইআত হওয়া, তার সাহায্য করা, তার সাথে সখ্যতা করা বা তার সহযোগীতা করা জায়েয নেই।

- তার পতাকাতলে যুদ্ধ করা, তার পিছনে নামায পড়া বা তার কাছে বিচার-ফায়সালার জন্য যাওয়া বৈধ নয়।

- মুসলিমদের উপর তার কর্তৃত্ব বৈধ নয়। মুসলিমদের উপর তার আনুগত্য আবশ্যক নয়। বরং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাকে অপসারণের চেষ্টা করা, তাকে প্রতিহত করার জন্য কাজ করা এবং তার স্থানে একজন মুসলিম শাসক বসানোর চেষ্টা করা ওয়াজিব।

- এর উপর ভিত্তি করে মাসআলা আরো বের হয়ে আসে:- যে তার সাথে বন্ধুত্ব করে বা তার কুফর বা কুফরী আইন-কানুনের সাহায্য করে, তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, তা দৃঢ় করার কাজে অংশগ্রহণ করে, তার বিধান পাশ করে বা তদানুযায়ী

বিচার ফায়সালা করে, সে কাফের। যা বর্তমানে বিচারপতি ও এধরণের লোকদের চলমান অবস্থা।

* নেতৃত্ব সংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- কোন মুসলিমের উপর কাফেরের কর্তৃত্ব বৈধ নয়। সুতরাং কোন কাফেরের জন্য মুসলমানদের গভর্ণর বা বিচারক হওয়া, নামাযের ইমামতি করা, কোন মুসলিম রমনীর বিবাহের অভিভাবক হওয়া, মুসলমানদের সন্তানদের অভিভাবক হওয়া বা তাদের লালন-পালন করা অথবা মুসলমানদের ইয়াতীম বা এধরণের লোকদের সম্পদের তত্বধান করা বৈধ নয়।

* বিবাহ সংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- কোন কাফেরের জন্য কোন মুসলিম নারীকে বিবাহ করা জায়েয নেই এবং সে তার বিবাহের অভিভাবকও হতে পারবে না...।

- যখন কোন মুসলিম পুরুষ মুসলিম নারীকে বিবাহ করে, অত:পর সে মুরতাদ হয়ে যায় তখন তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদেরকে পৃথক করে দেওয়া আবশ্যক।

* উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে ধর্মের ভিন্নতা উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক।

* রক্ত ও 'কিসাসের বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- কাফেরের বদলায় মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না...।

- হারবী কাফের বা মুরতাদকে ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত: হত্যা করলে কোন কাফ্ফারা বা দিয়্যত নেই। পক্ষান্তরে মুসলিমের বেলায় দিয়্যত ওয়াজিব...।

* জানাযা সংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- কাফেরের জানাযা পড়া যাবে না, গোসল দেওয়া যাবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না।

- তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বা তার কবরের পাশে দণ্ডায়মান হওয়া জায়েয নেই।

* পক্ষান্তরে মুসলিমের বিধান এর বিপরীত।

* বিচার সংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- কাফেরের বিচারপতি হওয়া বৈধ নয়।

- মুসলিমের উপর কাফেরের সাক্ষ্য জায়েয নেই...।

- কুফরী আইনের মাধ্যমে বিচারকারী কাফের বিচারকের নিকট বিচার-ফায়সালার জন্য যাওয়া জায়েয নেই; শরয়ীভাবে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না এবং তার কোন ফলাফলও বর্তাবে না।

* যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- কাফের, মুশরিক ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ আর বিদ্রোহী ও অবাধ্য মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের মাঝে পার্থক্য করতে হবে।

- তাই মুসলিমদের মুদাব্বার (মুনিবের মৃত্যুর সাথে যে ক্রীতদাসের মুক্তিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে) কে কিছু বলা হবে না।

- তাদের আহতদেরকে মেরে ফেলা যাবে না, তাদের সম্পদর গনিমত হবে না, তাদের নারীদেরকে বন্দী করা হবে না ইত্যাদি..। পক্ষান্তরে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে এসব বৈধ।

- মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষেত্রে মূল বিধান হচ্ছে তার ঈমানের কারণে তা সুসংরক্ষিত বা নিরাপদ। পক্ষান্তরে কাফেরের এ সমস্ত বিষয়ের মূল বিধান হচ্ছে তা মুসলিমদের জন্য বৈধ; তবে যদি নিরাপত্তাচুক্তি বা এ ধরণের কোন মাধ্যমে তা সংরক্ষিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

* বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ সংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- মুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ওয়াজিব; তার থেকে পরিপূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয নেই। তবে তার গুনাহসমূহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে...।

পক্ষান্তরে কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করা বা মুসলমানদের গোপন তথ্য তাকে জানিয়ে দেওয়া হারাম। বরং তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে; তার সাথে সম্প্রীতি জায়েয নেই।

এছাড়াও আরো অনেক শরয়ী বিধি-বিধান এই স্পর্শকাতর ও বিস্তৃত প্রভাব সৃষ্টিকারী বিধানটির সাথে সম্পর্কিত। এগুলো তার সামান্য কিছু মাত্র। এ কয়েকটির মাধ্যমে শুধু উদাহরণ দেওয়া ও সামান্য ইঙ্গিত দেওয়াই উদ্দেশ্য। আর এ সকল মাসআলা দলিল ফিকহের কিতাবসমূহ ও অন্যান্য কিতাবসমূহে স্ব-স্ব জায়গায় সকলের জানা শোনা আছে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৭৫১

ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

আহমাদ নাবিল

Junior Member

১২-১৫-২০১৮

১/গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের বিধান:

আল্লাহ তালা বলেন: **الا له الحكم** একমাত্র তারজন্যই সকল বিধান

২/গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের ইচ্ছামত ফাইসাল ....
আর আল্লাহ বলেন :**وان احكم بينهم بما أنزالله**

৩/গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের বানানো বিধান ,,,,,আল্লাহ বলেন **ام لهم شركائ شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله** তাদের জন্য কি এমন শরিক রয়েছে যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন বানায় যার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই।

৪/গণতন্ত্র বলে সমস্যা হলে সংসদে যাও ,,,,,আর আল্লাহ বলেন **فإن تنا زعتم في شئ فردوه الي الله والرسول** তোমরা কোন বিষয়ে বিতর্ক করলে, আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে যাও।

৫/গণতন্ত্রে কাফেররাও নেতা হয়

আল্লাহ বলেন :

ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا

মুসলমানদের উপর কাফেরদের কোন অধিকার নেই।

৬/গণতন্ত্র এর ভিত্তি হচ্ছে নির্বাচন,যে কোন দলকে গ্রহণ করার অধিকার থাকে চাই কোরআন বিরোধী হোক আল্লাহ বলেন ,, **ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم** আল্লাহ ও তার রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করেন তখন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন কোন মতের দিকে যাওয়ার সুযোগ থাকে না।

৭/গণতন্ত্র সব ধরনের কুফুরী মতের স্বাধীনাতা দেয় ...

আর আল্লাহ বলেন ; **لعن الذين كفروا من بني إسراءيل علي لسان داوود وعيسي ابن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون كانو لا يتناهون عن منكر فعلو** বনী ইসনায়ীল থেকে যারা কুফুরী করেছে দাউদ ও ইসা ইবনে মারয়ামের ভাষায় তাদের কে তিরষ্কার করা হয়েছে ,কারণ তারা অপরাধ করেছে ও সিমালঙ্ঘনকারী ছিল । তারা কোন অনিষ্ট কাজ থেকে বাধা দিতনা ।

৮/গণতন্ত্র অধিকাংশ মানুষের মতকে গ্রহন করে ,,,

আর আল্লাহ বলেন: **وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل لله** জমিনের অধিকাংশ মানুষের অনুসরন করলে তারা আপনাকে আল্লাহ রাস্তা থেকে বিচ্ছ্যুত করে ফেলবে ।

৯/হক ও বাতিলের মধ্যে সমান করদেয় ,,,

আর আল্লাহ বলেন: **أفنجعل المسلمين كالمجرمين** আমি কি মুসলমাদেরকে অপরাধীদের মত বানাব ?

১০/গণতন্ত্র উম্মতকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় ।

আর আল্লাহ বলেন ,, **واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا** সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধর ।

হে ঈমানদার ভাই !!

তুমি যখন জানতে পারলে যে,গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের বানানো বিধান । তাহলে জেনে রাখ,ইহা ইসলামের বিপরীত, বরং ইহা এক প্রকার তাগুত যাকে অস্বীকার আবশ্যক ....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৭৮৫

salahuddin aiubi

Senior Member

১২-১৪-২০১৮

তাই যে মুসলমান-কাফেরের মাঝে কোন ভেদাভেদ করে না, তার কাছে এসব বিষয়গুলো, বরং পুরো দ্বীনই সংশয়পূর্ণ হয়ে যাবে!!

এছাড়াও দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে সাধারণভাবে সতর্ক ও নিষেধ করে অনেক শরয়ী বর্ণনা এসেছে, যেমন: ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين

"তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাক, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে।"

- ইমাম তবরানী (রহ.) তার আলকাবীরে ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন:

صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق

"আমার উম্মতের দু'টি শ্রেণী আমার সুপারিশ লাভ করবে না: জালেম অত্যাচারী শাসক ও দ্বীন থেকে বিচ্যুত সীমালঙ্ঘনকারী"। (হাদীসটি হাসান)।

- অনুরূপ অনেক শরয়ী বর্ণনা এসেছে, যা বিশেষভাবে তাকফীরের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা থেকে সতর্ক করে এবং যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেমন:

- ইমাম বুখারী (রহ.) তার সহীহের কিতাবুল আদাবে বর্ণনা করেন, অধ্যায়: 'যে তার ভাইকে কোনরূপ বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিত কাফের আখ্যা দেয় সে নিজেই তার কথার অনুরূপ': আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, **إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما** "যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে বলে 'হে কাফের' তখন তাদের দু'জনের একজন অবশ্যই তাতে পতিত হয়।"

- হযরত সাবেত ইবনুয যাহ্হাক (রহ.)এর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্মের নামে শপথ করে, সে তার কথার মতই হবে। আর যে নিজেকে কোনো বস্তু দ্বারা হত্যা করে তাকে জাহান্নামে উক্ত বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। মুমিনকে অভিশম্পাত করা, তাকে হত্যা করার ন্যায়। যে কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দেয়, এটা তাকে হত্যা করার মতই।"

তিনি তার সহীহের একই পর্বের 'গালমন্দ ও অভিশম্পাত করা থেকে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসসমূহের অধ্যায়ে' বর্ণনা করেন: আবু জর রা: থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সা: কে বলতে শুনেছেন,

لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، أن لم يكن صاحبه كذلك

"যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ফাসেক বা কাফের বলে অপবাদ দেয়, যদি তার সাথী অনুরূপ না হয়, তবে বিষয়টি তার উপরই ফিরে আসবে।

- ইমাম মুসলিম রহ.ও তার সহীহের কিতাবুল ঈমানে হযরত আবু জর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছেন:

ليس من رجل أدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله ، وليس كذلك إلا حار عليه

“যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজ পিতা ব্যতিত অন্য কারো দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সে কাফের হয়ে যাবে। যে এমন জিনিস দাবি করে যা তার মাঝে নেই সে আমাদের মধ্য থেকে নয়। আর সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। যে কোন ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দেয় অথবা ‘আল্লাহর শত্রু’ বলে, অথচ ওই ব্যক্তি অনুরূপ নয়, তবে বিষয়টি তার উপর প্রত্যাবর্তন করবে।“

- হাফেজ আবু ইয়ালা হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন,

إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره ، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك ، قال: قلت: يا نبي الله ، أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي ؟ قال: بل الرامي

“আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়গুলোর ভয় করি তার মধে একটি হচ্ছে: একজন লোক কোরআন পড়বে, অত:পর তার মাঝে তার প্রভাবও পরিলক্ষিত হবে। আর সেসময়ও তার চাদরটি থাকবে ইসলামের। অত:পর যতদিন আল্লাহ চাইবেন, ততদিন সে উক্ত চাদরের আড়াল গ্রহণ করবে। কিন্তু সবশেষে সে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, দ্বীনকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে স্বীয় প্রতিবেশীর উপর তরবারী উত্তোলন করবে এবং তাকে কুফরীর অপবাদ দিবে।

সাহাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কোন্‌জন শিরকের অধিক নিকটবর্তী? যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে সে, না যে অপবাদ দিয়েছে সে? রাসূল সা. বললেন, বরং যে অপবাদ দিয়েছে সে।“

হাফেজ ইবনে কাসীর রহ: **و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين** (“এবং (হে রাসূল!) তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়”) আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান।

এ সমস্ত বিশুদ্ধ হাদীসগুলোতে যে ধমকি ও সতর্কবাণী রয়েছে তা অবশ্যই বিবেকবানদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে সতর্ক হতে উদ্ধুদ্ধ করবে। বিশেষ করে এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে সাহায্য করবে। কেননা এই হাদীসগুলোর বাহ্যিক ফায়সালা হলো: যে কোন মুসলমানকে এমন বিষয়ের দ্বারা তাকফীর করে, যার দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তাকফীর করেন না, সে নিজেই এর কারণে কাফের হয়ে যাবে।

এটা কঠিন ধমকি। উলামায়ে কেরাম এটাকে কঠিন মনে করার কারণে এর একাধিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউ কেউ যে ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা হচ্ছে:

“যে এই ধরণের কবীরা গুনাহে লিপ্ত হতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তা বলার ব্যাপারে দু:সাহসী হয়ে উঠে, তাকে এ বিষয়টি কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দিবে বা কুফরের উপর তার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। কেননা গুনাহ হল কুফরের বার্তাবাহক। আর তার মধ্যে বড়গুলো, ছোটগুলো থেকে দ্রুতগামী। আর যে কবীরা গুনাহসমূহের ব্যাপারে অবজ্ঞা করে, তার ব্যাপারে আশংকা রয়েছে, তার অবজ্ঞা তাকে কুফরের উপকরণসমূহে অনুপ্রবেশ করা ও তাতে লিপ্ত হওয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে।”

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৭৭৬

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ১০; পাঁচ. হত্যা

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-১৪-২০১৮

তা'যিরের পঞ্চম প্রকার: হত্যা

পাঁচ: হত্যা

হত্যার মাধ্যমেও তা'যির হতে পারে। সাধারণত একে **القتل سياسةً** তথা সিয়াসতরূপে হত্যা বলা হয়। কোরআন সুন্নাহয় তা'যিররূপে হত্যার নির্দেশনা এসেছে।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"কাউকে হত্যা বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ব্যতীতই কেউ কাউকে হত্যা করলে, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল।" - মায়েদা: ৩২

এ আয়ত থেকে বুঝা যায়, কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা যাবে। তদ্রূপ কেউ পৃথিবীতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা করে বেড়ালে তাকেও হত্যা করা যাবে।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

فكان في مضمون الآية إباحة قتل المفسد في الأرض. اهـ

"আয়াত বুঝাচ্ছে- যমিনে বিশৃংখলাকারীকে হত্যা করা বৈধ।" - আহকামুল কোরআন: ২/৫০৫

ফাসাদ দুনিয়াবিও হতে পারে, দ্বীনিও হতে পারে।

দুনিয়াবি ফাসাদ, যেমন: চুরি, ডাকাতি, রাহজানি, সন্ত্রাসী, খুন, ধর্ষণ, যাদু-টোনা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের শান্তি-শৃংখলা নষ্ট করা, জনজীবন অতিষ্ট করে তোলা।

দ্বীনি ফাসাদ, যেমন: ইলহাদ, যান্দাকাহ্, নাস্তিকতা, বিদআত ইত্যাদি ছড়ানো।

এ উভয় ধরণের ফাসাদকারীকেই হত্যা করা যাবে, যদি হত্যা ব্যতীত তার অনিষ্ট দমন সম্ভব না হয়।

এক হাদিসে সমকামীকে হত্যার কথা এসেছে:

(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)

"কাউকে লূত আলাইহিস সালামের কাওমের মতো কাজ (অর্থাৎ সমকামিতা) করতে দেখলে যে করেছে এবং যার সাথে করেছে, তাদের উভয়কে হত্যা করে দাও।" - আবু দাউদ: ৪৪৬৪, তিরিমিযি: ১৪৫৬

অর্থাৎ বিবাহিত হলেও হত্যা কর, অবিবাহিত হলেও হত্যা কর।

অন্য হাদিসে পশুর সাথে সঙ্গমকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে:

(من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه)

"কাউকে কোন পশুর সাথে সঙ্গম করতে দেখলে হত্যা করে দেবে।" - আবু দাউদ: ৪৪৬৬, তিরিমিযি: ১৪৫৫

অন্য হাদিসে মাহরাম মহিলার সাথে যিনাকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে:

(ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)

"যে ব্যক্তি তার মাহরামের সাথে যিনা করে, তাকে হত্যা করে দাও।" - তিরিমিযি: ১৪৬২

অর্থাৎ বিবাহিত হলেও, না হলেও।

আমাদের আইম্মায়ে কেরামের মতে এসকল হত্যার কোনটাই হদ নয়, বরং তা'যির। কাজেই সর্বাস্থায় এদের হত্যা করা জরুরী নয়। যারা এসব কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে দমন করতে হত্যার প্রয়োজন পড়বে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর যাদেরকে হত্যা ছাড়াই দমন করা সম্ভব, তাদেরকে হত্যা করা হবে না।

'আদদুররুল মুখতার' গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,

ويكون) التعزير (بالقتل). اهـ

"তা'যির হত্যার দ্বারাও হতে পারে।" - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা): ৪/৬২

আল্লামা শামী রহ. (১২৫২হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন,

رأيت في [الصارم المسلول] للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي - ﷺ - وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها. اهـ ... ومن ذلك ما سيذكره المصنف من أن للإمام قتل السارق سياسة أي إن تكرر منه. وسيأتي أيضا قبيل كتاب الجهاد أن من تكرر الخنق منه في المصر قتل به سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل، وسيأتي أيضا في باب الردة أن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت، وأن الخناق لا توبة له وتقدم كيفية تعزير اللوطي بالقتل. اهـ كلام ابن عابدين رحمه الله

"হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর 'আসসারিমুল মাসলূল' গ্রন্থে দেখেছি: [হানাফিদের একটি মূলনীতি হলো- তাদের মতে যেসব অপরাধের শাস্তি হত্যা নয়; যেমন: ভারি বস্তু দ্বারা হত্যা করা, যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য পথে সঙ্গম করা; যদি ব্যক্তি থেকে তা একাধিকবার প্রকাশ পায়, তাহলে ইমামুল মুসলিমীন তাকে হত্যা করতে পারবেন। তদ্রূপ মাসলাহাত মনে করলে তিনি নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তিও দিতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ সকল অপরাধের বেলায় বর্ণিত হত্যাকে তারা এর উপর প্রয়োগ করেন যে, এতে তিনি মাসলাহাত রয়েছে মনে করেছেন। একে তারা 'সিয়াসতরূপে হত্যা' নাম দিয়ে থাকেন। এর সারকথা: যেসব অপরাধের অনুরূপ

অপরাধে হত্যার বিধান রয়েছে, সেগুলো যখন বারংবার সংঘটিত হওয়ার দ্বারা গুরুতর অবস্থা ধারণ করবে, তখন সেগুলোতে তিনি তা'যিররূপে হত্যা করতে পারবেন।] হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য শেষ হল। ...

(শামী রহ. বলেন,) গ্রন্থকার সামনে যা উল্লেখ করবেন, সেটাও এই শ্রেণীভুক্তই। তা হল- ইমামুল মুসলিমীন সিয়াসতরূপে চোরকে হত্যা করতে পারবেন। অর্থাৎ যখন তার থেকে বারংবার চুরি প্রকাশ পাবে। কিতাবুল জিহাদের একটু আগে আলোচনা আসবে যে, যে ব্যক্তি থেকে শহরের অভ্যন্তরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার ঘটনা বারংবার ঘটবে, তাকে সিয়াসতরূপে হত্যা করে দেয়া হবে। কেননা, সে যমিনে ফাসাদ করে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, যার অবস্থা এমন হবে- তাকে হত্যা করে দিয়ে তার অনিষ্ট দমন করা হবে। বাবুর রিদ্দাহয় আলোচনা আসবে- যাদুকর কিংবা এমন যিন্দিক, যে নিজ কুফরি অভিমতের দিকে লোকজনকে দাওয়াত দেয়: যদি তাওবা করার আগেই ধৃত হয় এরপর তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল হবে না বরং হত্যা করে দেয়া হবে। আর তাওবা করার পর ধৃত হলে তাওবা কবুল হবে। সামনে এও আসবে যে, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারীর কোন তাওবার সুযোগ নেই। আর সমকামিকে তা'যিররূপে কিভাবে হত্যা করা হবে তার আলোচনা আগে গেছে।" - রদ্দুল মুহতার: ৪/৬২-৬৩

সহজ কথা: যাকে হত্যা ছাড়া দমন সম্ভব না, তাকে হত্যা করে দমন করা হবে। এই হত্যা হদ হিসেবে নয়, তা'যির হিসেবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৭৮০

ব্যক্তি দেখে 'হক' চেনা যায় না

abudujanah

Senior Member

১২-২৫-২০১৮

قَالَ علي رَضِيَ اللَّهُ عنه للحارث بْن حوط وَقَدْ قَالَ لَهُ أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير ﷺ عَلَى باطل ؟ فَقَالَ لَهُ : يا حارث! إِنَّهُ ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله.

الإمام ابن الجوزي رحمه الله =في تلبيس إبليس

একবার হযরত হারেস বিন হাওত রহ. হযরত আলী রাযি. কে বললেন, আপনি কি মনে করেন, হযরত তালহা রাযি. ও হযরত যুবায়ের রাযি. (যারা ইজতেহাদি ভুলের শিকার হয়ে উটের যুদ্ধে হযরত আলী রাযি.র বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন) বাতিলের উপর ছিলেন বলে আমরা মনে করবো? তখন হযরত আলী রাযি. বললেন, শোন হারেস! ব্যাপারটি তোমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে আছে। আসলে ব্যক্তি দেখে হক চেনা যায় না। তুমি আগে হক চিনো তাহলে কে হকপন্থী? তা বুঝতে পারবে।

-ইমাম ইবনুল জাওযী রহ.

তালবীসে ইবলিস

واعلم أن عموم أصحاب المذاهب (الباطلة) يعظّم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بما قَالَ، وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إِلَى القول (صحيح أم لا) لا إِلَى القائل.

الإمام ابن الجوزي رحمه الله =في تلبيس إبليس

জেনে রাখুন, অধিকাংশ বাতিল ধর্মের অনুসারীরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে সম্মানের পাত্র বলে ঠিক করে নেয়। এরপর কোন রকম চিন্তা ভাবনা ছাড়া সে যা-

ই বলে তা-ই মেনে নেয়। এটাই হল সুস্পষ্ট গোমরাহী। কারণ, উচিত হল, কারো কথার দিকে দেখা, (কথাটি সঠিক? না, ভুল?) শুধু ব্যক্তিকে দেখা ঠিক নয়।

-ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. তালবীসে ইবলিস

لا يعرف الحق بالرجال : معناه أنه ليس مجرد سلوك الرجل بقولٍ أو فعلٍ هو دلالةٌ على أنه مصيب، بل كما قدَّمتُ لكم الحكم على الأقوال والأعمال ... عند أهل السنة والجماعة ... : ميزانان فقط : النص (الكتاب والسنة)، والإجماع.

-الشيخ عبيد بن عبدالله الجابري حفظه الله

'ব্যক্তিকে দেখে হক চেনা যায় না' কথাটির উদ্দেশ্য হল, কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বললে কিংবা কোনো কাজ করলে, তা এ কথার প্রমাণ নয় যে, তিনি যা বলেছেন অথবা যা করেছেন তা সঠিক বরং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ'র নিকট যে কোনো কথা ও কাজ সঠিক কিনা তা যাচাইয়ের জন্য দুটি মাপকাঠি রয়েছে। একটি হল, নস-কোরআন ও সুন্নাহ। অপরটি হল, সালাফদের ইজমা।

-শাইখ ওবায়েদ বিন আব্দুল্লাহ আল জাবেরী হাফি.*

ولقد زل أقوامٌ بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك على جادة الصحابة والتابعين و اتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل

.الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام

বহু জাতি কিছু ব্যক্তির ওপর ভরসা করে দলিল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এ ভাবে তারা সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনের সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং নিজেদের কিছু লোকের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে ছিটকে পড়েছে।

-ইমাম শাতেবী রহ. আল ই'তিসাম

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৮৮৭

অজ্ঞাত আমীরের হাতে বাইয়াত: ইমামের পরিচয় কতটুকু জরুরী?

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-১৩-২০১৮

এক ভাই জানতে চেয়েছিলেন,

'আমরা অজ্ঞাত আমীরের হাতে বাইয়াত দিয়ে জিহাদের কাজ করি, এটা কতটুকু শরীয়তসম্মত'?

প্রশ্নটা শুধু ভাইয়েরই নয়, আরো অনেকেরই হয়তো। বিশেষত যারা জিহাদের সাথে জড়িত না, তাদের অনেকের এ প্রশ্ন। আবার যারা মুজাহিদদের বাঁকা চোখে দেখেন, তারা প্রশ্নটা করে থাকেন মুজাহিদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্য।

প্রথমত এখানে মনে রাখা চাই যে, আমীর অজ্ঞাত- এই বাহানায় জিহাদ তরক করার কোন সুযোগ নেই। যেমন, ইমাম কে তা না জানার কারণে নামায মাফ হয়ে যায় না।

দ্বিতীয়ত: জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য কোন একটা হক জিহাদি জামাতে যোগ দেয়া আবশ্যক। সকল মুসলমানেরই এটা দায়িত্ব। জিহাদি জামাত খুঁজে বের করা সবার দায়িত্ব। আমীর অজ্ঞাত- এই বাহানায় জামাতে যোগ দেয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই।

তৃতীয়ত: আমীর অজ্ঞাত- কথাটাও মুশকিল। একেবারে যারা জিহাদ থেকে গাফেল ও বেখবর হয়ে বসে আছেন, তাদের কাছেই মূলত আমীর অজ্ঞাত। নতুবা যারা দুনিয়ার কিছুটা খবরাখবর রাখেন, মুসলিম উম্মাহর অবস্থা নিয়ে ফিকির করেন, জিহাদের সত্য তামান্না রাখেন, এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন- তাদের নিকট আমীর অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। জিজ্ঞেস করি- মোল্লা উমরকে রঃ কে না চেনে? শায়খ উসামার ব্যাপারে কার জানা শুনা নেই? আলকায়েদার আমীর যে আইমান আযযাওয়াহিরি তা কার না জানা? আসেম উমার হাফিযাহুল্লাহ যে উপমহাদেশে আলকায়েদার আমীর কথাটা কে জানে না? একজন সচেতন মুসলমান তো পরের

কথা; দ্বীনের দুশমনরাও তো তাদেরকে ভাল করে চেনে। এমনকি তাদের বয়ান-বক্তৃতা, লেখা-লেখি ও নির্দেশনাগুলোও তারা জানে। কিন্তু হায়! আমি এমনই দ্বীনসচেতন (!!) মুসলমান, আমি এদের কাউকেই চিনি না। জিহাদের ফরয দায়িত্ব থেকে একেবারেই যারা বেখবর, কিংবা জিহাদ থেকে একেবারেই বিমুখ- তারাই কেবল চেনে না। নতুবা বর্তমান দুনিয়ার অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদেরকে না চেনার কথা না।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমীর – বর্তমান আমীরুল মু'মিনীন হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফিযাহুল্লাহ - যাকে আমরা চিনি না বলে বাহানা খোঁজছি, মূলত তিনি অপরিচিত কেউ নন। অতি গোপনে কোন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অজ্ঞাত ক'জন লোক কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আমীর নির্ধারণ করেনি। আফগানের আহলুল হল ওয়াল আকদ এর বাইয়াতের মাধ্যমে সকলের নিকট সুপরিচিত একজন বিশিষ্ট মুজাহিদ আলেমে দ্বীনকে আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে। তাকে না চেনা মূলত তিনি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে নয়, আমার নিজের বেখবরি আর গাফলতির কারণে।

তদ্রূপ, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অধীনস্ত আন্তর্জাতিক জিহাদি সংগঠন আলকায়েদার আমীর শায়খ আইমান আযযাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহও অপরিচিত কেউ নন। তিনি মিশরের সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের উচ্চশিক্ষিত প্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তি। তার রাজনৈতিক ও জিহাদি জীবন আরব বিশ্বে অতি পরিচিত। তিনি প্রসিদ্ধ জিহাদি সংগঠন জামাআতুল জিহাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রকাশ্যে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ করেছেন। জেল খেটেছেন। নির্যাতন সহ্য করেছেন।

আলকায়েদা উপমহাদেশের আমীর আসেম উমর হাফিযাহুল্লাহও অপরিচিত কেউ নন। তিনি কোথায় কোথায়ে লেখাপড়া করেছেন, কোথায় কোথায় জিহাদ করেছেন সবই জানা। ইমারতে ইসলামিয়ার সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবেই তাকে আলকায়েদা উপমহাদেশের আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে।

এমনিভাবে যে দেশে যাকে আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে সবাই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ঘোষণার মাধ্যমেই তাদের আমীর বানানো হয়েছে। এভাবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে আমীর নির্ধারণ করে জামাত গঠন করে

তাদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন যাবৎ জিহাদের কাজও চলছে। এর চেয়ে বেশি আর কতটুকু জানার দরকার আছে?

এ গেল বাহিরের লোকদের কথা। আর তানজীমে জড়িতরা তো তাদেরকে ভাল করেই চেনেন। তাদের বয়ান বক্তৃতা নিয়মিত শুনেন। নির্দেশনার দিলে সেগুলো সবার কাছে পৌঁছে যায়। মেনে চলার চেষ্টা করেন। প্রচারেও সচেষ্ট হন যথেষ্ট। প্রশ্ন করি- এর চেয়েও অতিরিক্ত চেনার আবশ্যকতা আছে কি?

এখানে আরেকটি কথা বলে রাখি। সেটা হল, তানজীমের আধিনস্ত আমীর উমারাদের ব্যাপারে। আমরা সাধারণত যাদের নির্দেশনায় কাজ করে থাকি। যাদের ভায়া হয়ে কেন্দ্রীয় উমারাদের নির্দেশনা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়। নিরাপত্তার স্বার্থে কাটআফ সিস্টেমের কাজ হওয়ায় তাদের সকলকে আমরা চিনি না। তবে এটা মূলত জিহাদের একটা কৌশল। জিহাদের স্বার্থে এ ধরণের কৌশল গ্রহণ করার অধিকার আছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে জরুরী। কৌশল ও গোপনীয়তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধনীতি দেখলে তাতে আর সংশয় থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

তবে এতটুকু কথা অবশ্যই সত্য যে, আমার উর্ধ্বতন প্রথম আমীর, তথা আমার যিনি সরাসরি আমীর, তাকে আমি ভাল করেই চিনি। কারণ, তার সাথে দীর্ঘ দিনের পরিচয়, জানা শুনা আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক না থাকলে তিনি আমাকে তানজীমে জড়িত করতেন না। দীর্ঘ পরিচয় ও যাচাই বাছাইয়ের পর যখন আমি যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছি, তখনই আমাকে তানজীমে নেয়া হয়েছে। তদ্রূপ, আমার আমীরের ব্যাপারেও আমার পূর্ণ আস্থা আছে বলেই আমি তার কথায় তানজীমে যোগ দিয়েছি। এরপর যখন তিনি আমাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং সেগুলো উর্ধ্বতন উমারাদের নির্দেশনা বলে জানাচ্ছেন এবং সেগুলো শরীয়ত বিরোধীও মনে হচ্ছে না- তখন তার কথামত চলতে আমার আর কোন বাধা নেই। তদ্রূপ, তিনি যদি আমাকে অন্য কোন আমীরের হাতে সোপর্দ করেন, তাহলেও আমি আশ্বস্ত যে, তিনি উপযুক্ত কারো হাতেই আমাকে সোপর্দ করেছেন। এরপর শরীয়তসম্মত সকল বিষয়ে তাকে মেনে চলতে আমার কোন সমস্যা নেই। জিজ্ঞেস করি, এর চেয়ে অতিরিক্ত আর কতটুকু জানার আবশ্যকীয়তা শরীয়তে আছে?

মুহতারাম ভাইয়েরা, আমীর অজ্ঞাত- এটা মুলত তেমন কোন ফেক্টর-ই নয়। আমরা যতটুকু জানি, ততটুকু আমাদের কাজের জন্য যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত না আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজন আছে, আর না শরীয়তের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতা আছে।

মুহতারাম ভাইয়েরা, সাহাবায়ে কেরামের সীরতের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি- এর বেশি দরকার নেই। আপনি তাকিয়ে দেখুন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মদীনায় খলিফা নির্ধারণ হলেন, তখন বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের কত জন তাকে চিনতো? আজ আমরা মোল্লা উমরকে, শায়খ উসামাকে, আইমান আযযাওয়াহিরিকে, আসেম উমরকে যতটুকু চিনি, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এর চেয়ে বেশি কিংবা এই পরিমাণও হয়তো অনেকে জানতো না। শুধু নামটুকুই হয়তো জানতো। কিংবা কিছু গুণ-সিফাত হয়তো জানতো। কিন্তু হযরত উমরকে দেখেছে কত জন? সুদূর মদীনা থেকে সেই রোম, সেই পারস্যের, সেই ইরাকের সকল মুসলিম কি তাকে চিনতো? সবাই কি তাকে দেখেছে? কিন্তু বাইয়াত তো সকলেই দিয়েছে। তদ্রূপ, হযরত উমর ইসলামী বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে যে উমারাদের নিযুক্ত করেছিলেন, তাদের সকলকেই কি সকলে চিনতো? সকলেই কি তাদেরকে দেখেছে? কিন্তু আদেশ তো সকলেই পালন করেছে। পরবর্তী সকল খলিফার বেলায়ও একই ঘটনা। বরং ইসলামী সাম্রাজ্য যত বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছে, খলিফা ও উমারাদের ব্যাপারে জানা শুনা ততই কঠিন হয়ে এসেছে।

অধিকন্তু বর্তমান যামানায় তো মিডিয়ার আদলে আমরা আমীর উমারাদের দেখতে পাচ্ছি, তাদের কথা বার্তা শুনতে পারছি। কিন্তু সে যামানায় তো এটার চিন্তাও করা যেত না। এতদসত্ত্বেও বাইয়াত তো ঠিকই হয়েছে। আদেশও পালন করে চলেছে। এতএব, এর চেয়ে বেশি জানা শুনার প্রয়োজন নেই। সাধারণ মুজাহিদ ও মুসলমানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হ্যাঁ, এখানে আরেকটা কথা আছে। যারা আহলুল হল ওয়াল আকদ; তথা যারা খলিফা নিয়োগ দেবেন, তাদের জন্য আবশ্যক খলিফার ব্যাপারে ভাল করে জানা শুনা। কেননা, একজন যোগ্য ইমাম নিয়োগ দিতে হলে যেসব সিফাত লক্ষ রাখতে হয়, সেগুলো ঠিকঠিক মতো আছে কি'না জানার জন্য ইমামকে চেনা জরুরী। তাদের ব্যাপারটা ভিন্ন। বাকি সকল মুসলমানের জন্য এর প্রয়োজন নেই।

কাযি আবু ইয়ালা রহ. (৪৫৮ হি.) বলেন,

ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه، إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الخلافة. ويجوز أن يسمي خليفة لمن عقد له الأمر. اهـ

"সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে চেনা বা তার নাম জানা সকলের জন্য আবশ্যক নয়। তবে যারা আহলুল হল ওয়াল আকদ, যারা দলীলরূপে গণ্য হবেন এবং যাদের (বাইয়াতের) মাধ্যমে খেলাফত সংগঠিত হবে- তাদের কথা ভিন্ন।" – আলআহকামুস সুলতানিয়্যাহ: ১/২৭

ইমাম মাওয়ারদি রহ. (৪৫০ হি.) বলেন,

فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه إلا أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة.

وقال سليمان بن جرير: واجب على الناس كلهم معرفة الإمام بعينه واسمه كما عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله.

والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل ، وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوج إليه ، كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد بهم الأحكام والفقهاء الذين يفتون في الحلال والحرام تلزم العامة على الجملة دون التفصيل إلا عند النوازل المحوجة إليهم ، ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الهجرة إليه ولما جاز تخلف الأباعد ولأفضى ذلك إلى خلو الأوطان ولصار من العرف خارجا وبالفساد عائدا ، وإذا لزمت معرفته على التفصيل الذي ذكرناه فعلى كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة له ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال. اهـ

“পূর্ববর্তী খলিফার অসিয়তের মাধ্যমে কিংবা আহলুল হল ওয়াল আকদের নির্বাচনের মাধ্যমে যখন দায়িত্বগ্রহণকারী ইমামের জন্য খেলাফত সংগঠিত হবে, তখন উম্মাহর সকলের জন্য এতটুকু জানা আবশ্যক যে, উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে খেলাফতের দায়িত্ব সমর্পিত হয়েছে। সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে চেনা বা তার নাম জানা তাদের জন্য আবশ্যক নয়। তবে যারা আহলুল হল ওয়াল আকদ, যারা দলীলরূপে গণ্য হবেন এবং যাদের (বাইয়াতের) মাধ্যমে খেলাফত সংগঠিত হবে- তাদের কথা ভিন্ন।

তবে সুলায়মান ইবনে জারির বলেন, আল্লাহকে এবং তার রাসূলকে চেনা যেমন আবশ্যক, সকলের জন্য সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে চেনা এবং তার নাম জানাও তেমনই আবশ্যক।

তবে জমহুর আইম্মার মতামত হল, ইমামের পরিচয় বিস্তারিত জানা জরুরী নয়, এক রকম জানাই যথেষ্ট। সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তা বা তার নাম জানা প্রত্যেকের জন্য জরুরী নয়। তবে যদি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যার ফলে চেনার দরকার পড়ে, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন- কাযি, যাদের মাধ্যমে বিচার আচারের ফায়সালা হয় এবং ফুকাহায়ে কেরাম, যারা হালাল হারামের ব্যাপারে ফতোয়া দিয়ে থাকেন: জনসাধারণের জন্য তাদের ব্যাপারে এক রকম জানা শুনা আবশ্যক, বিস্তারিত নয়। তবে যদি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যার ফলে চেনার দরকার পড়ে, তাহলে ভিন্ন কথা।

যদি উম্মাহর সকলের জন্য সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে চেনা এবং তার নাম জানা জরুরী হতো, তাহলে (তাকে চেনার জন্য) হিজরত করার দরকার পড়তো। দূরবর্তীদের জন্য না যাওয়ার সুযোগ থাকতো না। ফলত সকল এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়তো। আর তখন এটা একতো স্বাভাবিক প্রচলনের পরিপন্থী হতো, অপর দিকে এর ফলে ফাসাদ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হতো।

উপরোক্ত যে বিবরণ আমি দিয়েছি, সে অনুযায়ী ইমামের পরিচিতি লাভের পর, কোন ধরণের বিরোধিতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা না দেখিয়ে প্রজাসাধারণের পরিচালনার সকল দায় দায়িত্ব তার হাতে সমর্পণ করা উম্মাহর সকলের অবশ্য কর্তব্য। যাতে তার প্রতি সমর্পিত মাসলাহাত ও পরিচালনায় দায় দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিতে পারেন।” – আলআহকামুস সুলতানিয়্যাহ: ১/২৪

লক্ষ করুন-

"উম্মাহর সকলের জন্য এতটুকু জানা আবশ্যক যে, উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে খেলাফতের দায়িত্ব সমর্পিত হয়েছে। সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে চেনা বা তার নাম জানা তাদের জন্য আবশ্যক নয়।"

ব্যস, এতটুকুই সাধারণ জনগণ ও সাধারণ মুজাহিদদের দায়িত্ব। এর বেশি নয়। না শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজন আছে, না কাজের জন্য প্রয়োজন আছে।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে করিয়ে দেয়া মুনাসিব মনে করছি। সেটি হল, এ যে বাইয়াতের কথা গেল, সেটা হল খেলাফতের বাইয়াত। যে বাইয়াত ফরয। যে বাইয়াত না দিয়ে মারা গেলে জাহিলি মরা মরবে বলে হাদিসে ধমকি এসেছে। পক্ষান্তরে আমাদের বর্তমান যে বাইয়াত সেটা খেলাফতের বাইয়াত না। সেটা মূলত জিহাদের বাইয়াত। খেলাফতের বাইয়াতের বেলায়ই যখন এতটুকু যথেষ্ট, তখন জিহাদের বাইয়াতের জন্য এর চেয়ে বেশির কি আবশ্যকতা আছে?

মোটকথা-

আহলুল হল ওয়াল আকদের বাইয়াতের মাধ্যমে আফগানের সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীনকে ইমারতে ইসলামিয়ার আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে। ইমারতে ইসলামিয়ার অধীনে আলকায়েদার কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন যাবৎ জিহাদ চলে আসছে। আমি একজন সাধারণ মুসলমান বা প্রাথমিক মুজাহিদ হিসেবে আমার দায়িত্ব তানজীমে জড়িত হয়ে জিহাদের ফরয আঞ্জাম দেয়া। জামাত নেই, আমীর নেই, আমীর চিনি না- এগুলো সব নিতান্তই বাহানা।

বি.দ্র.

এখানে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেয়া জরুরী মনে হচ্ছে। সেটা হল, আমরা যখন বলছি, 'আমীরের পরিচয় এর চেয়ে বেশি জরুরী নয়'- তখন এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ আলকায়েদার কথা বললে বা কোন জিহাদি তানজীমের কথা বললেই তাতে কোন তাহকীক ছাড়া যোগ দিয়ে দিতে হবে। বরং আমার উদ্দেশ্য, যখন আমি যথাযথ তাহকিকের পর তানজীমে যোগ দিতে চাচ্ছি বা যোগ দিয়েছি, তখন আর এর চেয়ে বেশি জানা জরুরী নয়। অতএব, তানজীমে যোগ দেয়ার

আগে ভালভাবে তাহকিক করে নিতে হবে। তাহকিকের পর তানজীমে যোগ দেয়া হলে এরপর আর উমারাদের ব্যক্তিপরিচয়ের তেমন জরুরত নেই।

কথাটা আরেকটু খুলে বলি: আলকায়েদা কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত সদস্য বানায় না, যতক্ষণ না তার ব্যাপারে যাচাই বাছাইয়ের পর নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তিনি জিহাদের এবং তানজীমের সাথী হওয়ার উপযুক্ত। হ্যাঁ, কখনোও যদি বাছাইয়ে ভুল হয়ে যায় সেটা ভিন্ন কথা। অতএব, যে কেউ জিহাদের যোগ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তানজীম তাকে সদসদ্য বানিয়ে নেবে না। তার ব্যাপারে যাচাই বাছাই করবে যথেষ্ট। এ গেল এক দিক।

অপর দিকে যিনি তানজীমে যোগ দিতে চাচ্ছেন, তারও উচিৎ, যিনি তাকে জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছেন, তার ব্যাপারে ভালভাবে তাহকিক করে নেয়া যে, তিনি আসলেই সত্য বলছেন কি'না? আসলেই তিনি হক জামাতের এবং তিনি যে তানজীমের কথা বলছেন, সেটার সদস্য কি'না? না'কি কোন গোয়েন্দা মুজাহিদের বেশ ধরে এসেছে? এসব বিষয় ভালভাবে যাচাইয়ের পরই কেবল তিনি তানজীমে যোগ দেবেন।

উভয় পক্ষ থেকে এভাবে যাচাইয়ের পর যখন কোন ব্যক্তি তানজীমে যোগ দেয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবেন এবং তিনিও তানজীমে যোগ দিতে মনস্থির করবেন, তখন তার জন্য তানজীমের উমারাদের ব্যাপারে অতিরিক্ত জানার প্রয়োজন নেই। তানজীমের উমারাদের সুনির্দিষ্টভাবে চেনেন না- এটা যেন তার তানজীমে যোগ দেয়ার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। বরং মোটামুটি পরিচয়ই যথেষ্ট। আইমান আযযাওয়াহিরি, আসেম উমর, মোল্লা উমর, শায়খ উসামা সহ আরো যারা প্রসিদ্ধ, তাদের ব্যাপারে মোটামুটি জানা শুনা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। না থাকলে যতটুকু প্রয়োজন তাদের ব্যাপারে জেনে নিতে পারে। এই মূহুর্তে তারা কোথায় আছেন- ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নে যাওয়া উচিৎ নয়। এটার না শরয়ী দিক থেকে দরকার আছে, না কাজের জন্য দরকার আছে। এরপরও এসব বিষয় মোটামুটি সবারই জানা থাকে। যেমন, ইমারাতে ইসলামী আফগানিস্তানের প্রধান আমীরুল মু'মিনীন যিনি হন, তিনি সাধারণত আফগানেই থাকেন। এটা মোটামুটি সকলেরই জানা। এ ধরণের বিষয়াদি এর চেয়ে অতিরিক্ত জানার তেমন কোন দরকার নেই। কাজের

জন্য দরকার না পড়লে এসব বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটির দরকার নেই এবং এগুলো না জানার অজুহাতে তানজীমে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকারও কোন হেতু নেই।

যাহোক, এই আমার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ- উভয় পক্ষ থেকে যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে গেলে, উমারাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বা বিস্তারিত জানা না থাকার কারণে তানজীমে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকার কোন হেতু নেই। তদ্রূপ, যোগ দেয়ার পর কাজের জন্য বিশেষ দরকার না পড়লে সেগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটিরও প্রয়োজন নেই। আমার উদ্দেশ্য এমনটাই। নতুবা, যে কেউ তানজীমে যোগ দিতে বললেই অন্ধভাবে তাহকিক ছাড়া তার কথা মেনে নিতে হবে- এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সত্য সঠিক বুঝ দান করুন।

ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১১৮৭

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৯

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-৩০-২০১৮

যিন্দিকের শাস্তি:

মুসলিম বেশধারী যিন্দিক যদি ধৃত হওয়ার আগেই তাওবা করে ভাল হয়ে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে আখেরাতের পাশাপাশি দুনিয়াতেও তার তাওবা কবুল হবে। ফলে তার উপর থেকে মুরতাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে মুসলমান গণ্য হবে। যেমন সাধারণ মুরতাদরা তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে তাদের তাওবা কবুল হয় এবং তাদের উপর থেকে মুরতাদের শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

মুসলিম পরিচয়ধারী কোন ব্যক্তি গোপনে গোপনে কাফের কি'না তা জানার পথ নেই। তাই কোন যিন্দিক ধৃত হওয়ার আগে তাওবার সূরত এ হবে যে, সে স্বেচ্ছায় কাযি বা ইমামুল মুসলিমিনকে জানাল, এতদিন সে কাফের ছিল। এখন তাওবা করে বাস্তবেই মুসলমান হয়ে গেছে। তাহলে সে মাফ পেয়ে যাবে। কারণ, স্বেচ্ছায় নিজের অবস্থা প্রকাশ করে তাওবা করা থেকে বুঝা যায়, সে বাস্তবেই তাওবা করেছে।

পক্ষান্তরে যদি শরয়ী দলীল প্রমাণ দিয়ে তার কুফর প্রমাণ হয় এবং তারপর ধৃত হয়ে কাযির দরবারে উপস্থিত হয়, তাহলে তখন তার তাওবা (ইখলাসের সাথে হলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও, দুনিয়ার বিচারে) গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তার ব্যাপারে প্রবল ধারণা এটাই যে, সে বাস্তবে তাওবা করেনি, হত্যা থেকে বাঁচার জন্য তাওবা জাহির করছে; যেমন এতদিন নিজেকে বাঁচানোর জন্য মুসলমান দাবি করে এসেছে।

সংশয়:

এখানে সংশয় হতে পারে যে, দারুল হরবে কাফেরদের উপর হামলা করলে যদি

তারা তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণযোগ্য হয়; তাহলে এখানে যিন্দিক ব্যক্তি তরবারির ভয়ে তাওবা করলে মাফ পাবে না কেন?

নিরসন:

হরবিরা এতদিন ইসলামের সাথে সুস্পষ্ট দুশমনি প্রকাশ করে আসছিল। এখন যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন স্বাভাবিক এটাই যে, তারা তাদের আগের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী বিশ্বাস ধারণ করেছে। কিন্তু যিন্দিক এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতদিন সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য –কাফের হওয়া সত্ত্বে- মুসলমান দাবি করে আসছিল। এখন ধরা পড়ার পর যখন নিজেকে মুসলমান দাবি করছে, তখন সে অতিরিক্ত কিছু করেনি, আগে যেমন মুসলমান দাবি করছিল, এখনও তেমনই দাবি করছে। আর তার কুফরি আকীদা থেকে ফিরে আসার দাবি যা সে করছে, তার ব্যাপারে প্রবল ধারণা এটাই যে, সে তরবারির ভয়ে শুধু জাহির করছে, বাস্তবে কুফর পরিত্যাগ করছে না। কেননা, এতদিন- কাফের হওয়া সত্ত্বে- নিজেকে বাঁচানোর জন্য শুধু মুসলমান দাবি করতো। এখন ধরা পড়ার পর তার আগের কুফর ছেড়ে দেয়া নিশ্চিত নয়। বরং প্রবল ধারণা এটাই যে, নিজেকে বাঁচানোর জন্যই এত দিনের মতো এখনও তাওবা জাহির করছে। পক্ষান্তরে হারবি কাফেররা নিজেদেরকে স্পষ্ট কাফের দাবি করে আসছিল। নিজেদের বাঁচানোর জন্য বা দুনিয়াবি কোন স্বার্থে নিজেদের মুসলমান দাবি করার কোন প্রমাণ তাদের থেকে নেই। তাই তাদের বেলায় এ সম্ভাবনা প্রবল যে, তারা বাস্তবেই মুসলমান হয়ে গেছে।

অন্য কথায় বলা যায়, যার জাহির তার বাতিনের বিপরীত প্রমাণিত হবে, দুনিয়ার বিচারে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়- যদিও ইখলাসের সাথে হলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে যাদের বাতিন তাদের জাহিরের অনুরূপ, তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন কারণ আছে। সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

***

দলীল-প্রমাণ ও আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য:

আল্লামা কাশ্মিরি রহ. (১৩৫২হি.) তার যুগান্তকারী গ্রন্থ ‘ইকফারুল মুলহিদিন’ এ বলেন,

قال: التفتازاني في "مقاصد الطالبين في أصول الدين": الكافر إن أظهر الإيمان خص باسم "المنافق"، وإن كفر بعد الإسلام "فبالمرتد"... وإن أبطن عقائد هي كفر بالإتفاق "فبالزنديق."

وقال في شرحه: قد ظهر أن: "الكافر" اسم لمن لا إيمان له: فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد، لرجوعه عن الإسلام ... وإن كان مع اعتر افه بنبوة النبي - ﷺ - وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالإتفاق، خص باسم الزنيدق. اهـ

“‘মাকাসিদুত ত্বালিবিন ফি উসূলিদ দ্বীন’ গ্রন্থে তাফতাযানি রহ. (৭৯২হি.) বলেন, কাফের যদি নিজেকে মু’মিন জাহির করে, তাহলে তাকে ‘মুনাফিক’ বলা হবে। যদি মুসলমান থাকার পর কাফের হয়, তাহলে বলা হবে ‘মুরতাদ’। ... আর যদি গোপনে গোপনে এমন সব আকীদা পোষণ করে, যেগুলো সর্বসম্মতিতে কুফর, তাহলে ‘যিন্দিক’।

তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন: এতক্ষণে স্পষ্ট হল যে, ‘কাফের’ হচ্ছে এমন ব্যক্তির নাম, যার ঈমান নেই। যদি সে নিজেকে মু’মিন জাহির করে তাহলে ‘মুনাফিক’ বলা হবে। যদি মুসলমান থাকার পর তার উপর কুফর আপতিত হয়, তাহলে বলা হবে ‘মুরতাদ’ তথা দ্বীনত্যাগী । কেননা, সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে। ... যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত স্বীকার করা এবং শাআয়েরে ইসলাম প্রকাশ্যে জাহির করা সত্ত্বেও গোপনে গোপনে এমন সব আকীদা পোষণ করে, যেগুলো সর্বসম্মতিতে কুফর, তাহলে ‘যিন্দিক’।” **(ইকফারুল মুলহিদিনি: ১২-১৩)**

অন্যত্র বলেন,

المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له، لا ظاهراً ولا باطناً فهو كافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهراً لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق، كما إذا اعترف بأن القرآن حق، وما فيه من ذكر الجنة والنار حق، لكن المراد بالجنة: الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار: هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار فهو زنديق. اهـ

"দ্বীনে হকের বিরোধী ব্যক্তি যদি জাহিরি বাতিনি কোনভাবেই তা স্বীকার না করে এবং তার প্রতি আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে সে '(প্রকাশ্য) কাফের'। যদি যবান দিয়ে তো স্বীকার করে কিন্তু তার অন্তর কুফরে অটল, তাহলে 'মুনাফিক'। আর যদি বাহ্যত স্বীকার করে কিন্তু জরুরিয়্যাতে দ্বীনের কিছু বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করে, যা সাহাবা-তাবেয়ীন যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং উম্মাহ যে ব্যাখ্যার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছে সে ব্যাখ্যার বিপরীত: তাহলে সেই হচ্ছে 'যিন্দিক'। যেমন: স্বীকার করলো যে, কোরআন সত্য এবং তাতে বিধৃত জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য; কিন্তু জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য- প্রশংসনীয় স্বভাবের কারণে অর্জিত প্রশান্তি, আর জাহান্নাম দ্বারা উদ্দেশ্য- নিন্দনীয় স্বভাবের কারণে উদ্ভূত অনুতপ্ততা; বাস্তবে কোন জান্নাত বা কোন জাহান্নাম নেই: তাহলে সে 'যিন্দিক'।" **(ইকফারুল মুলহিদিনি: ৪৪)**

কাশ্মিরি রহ. এর বক্তব্যের সারকথা- মুসলমান দাবিদার যে ব্যক্তি অন্তরে কুফর পোষণ করে (কিন্তু তার কুফর জনসম্মুখে প্রকাশ পায় না) সে মুনাফিক। আর যে মুসলমান দাবি করার পরও গোপনে গোপনে কোন কুফরী আকীদা পোষণ করে কিংবা জরুরিয়্যাতে দ্বীনের কোন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করে যা সাহাবা, তাবেয়ীন ও উম্মাহর ইজমার পরিপন্থী: সে যিন্দিক।

উল্লেখ্য, কাশ্মিরি রহ. এখানে যিন্দিকের ব্যাপক ও সামাজিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা, যদি মুসলমান নামধারী কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের বিপরীত ব্যাখ্যা করতে থাকে, তাহলে ফিকহের পরিভাষায় সে সুস্পষ্ট মুরতাদ গণ্য হবে। সামাজিকভাবে তাকে যিন্দিক বলা হলেও তার উপর মুরতাদের বিধানই প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ যদি সে তার এসব কুফরি

আকীদা পরিত্যাগ করে সত্য ইসলামে ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে যেমন তার তাওবা কবুল হবে, দুনিয়াতেও সে হত্যা থেকে বেঁচে যাবে। যেমন- ঐসব কাদিয়ানি ও শীয়া, যারা নিজেদের কুফরি আকীদা সুস্পষ্টই প্রকাশ করে থাকে। কাদিয়ানিরা শেষ নবীর অর্থের অপব্যাখ্যা করে থাকে। শীয়ারা কোরআন মানে কিন্তু ভিন্ন কোরআন। এরা সামাজিকভাবে যিন্দিক হলেও ফিকহের ভাষায় মুরতাদ। এরা তাওবা করলে মাফ পাবে।

পক্ষান্তরে যদি তারা বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, প্রকাশ্যে তাদের থেকে কোন কুফর প্রকাশ না পায, কিন্তু গোপনে গোপনে এসব অপব্যাখ্যা ও কুফরী আকীদা পোষণ করে; ঘটনাক্রমে বা নির্ভরযোগ্য মনে করে কারো নিকট প্রকাশ করার দ্বারা তা প্রকাশ পায়: তাহলে ফিকহের পরিভাষায় তারা যিন্দিক। এদের বিধান সাধারণ মুরতাদের থেকে ভিন্ন।

অন্য কথায় বলা যায়, যিন্দিক মূলত মুনাফিক। কিন্তু ঘটনাক্রমে যার কুফর প্রকাশ হয়ে যাবে- কিন্তু সে অস্বীকার করতে থাকবে যে, সে কাফের না বা কোন কুফরি আকীদা পোষণ করে না- সে যিন্দিক। পক্ষান্তরে যে প্রকাশ্যে কুফর করে বেড়ায়, সে যিন্দিক নয়, মুরতাদ। সামাজিকভাবে ব্যাপক অর্থে ক্ষেত্রবিশেষে তাকে যিন্দিক বলা হলেও ফিকহের ভাষায় সে মুরতাদ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

الزنديق فى عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره. اهـ

“এসকল ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় যিন্দিক হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার মুনাফিক। আর তা হচ্ছে, বাহ্যত মুসলমান জাহির করা কিন্তু অন্তরে ভিন্ন কিছু পোষণ করা।” **(মাজমুউল ফাতাওয়া: ৭/৪৭২)**

অর্থাৎ এই মুনাফিকের কুফর যখন তার অসতর্কতাবশত ঘটনাক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন সে যিন্দিক।

যিন্দিক বাহ্যত যেটাকে নিজের দ্বীন বলে প্রকাশ করছে, বাস্তবে সেটা তার দ্বীন নয়। বরং সে এর বিপরীত আকীদা রাখে। এ কারণে তাকে 'বে-দ্বীন'ও বলা হয়। এ হিসেবে ইবনুল ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

وهو من لا يتدين بدين. اهـ

"যিন্দিক হচ্ছে যার কোন দ্বীন নেই (তথা বেদ্বীন)।" **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৮)**

যিন্দিকের কুফর প্রকাশ কিভাবে হবে, এ সম্পর্কে বলেন,

فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أمن إليه. اهـ

"তার অবস্থা সম্পর্কে অবগতির পন্থা হল- হয়তো কোন মুসলমান ঘটনাক্রমে তা জেনে ফেলবে, নতুবা নির্ভরযোগ্য মনে করে কারো কাছে গোপনে তা প্রকাশ করবে।" **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৮)**

বুঝা গেল, যে যিন্দিকের শাস্তি সাধারণ মুরতাদের চেয়ে ভিন্ন, যার তাওবা দুনিয়ার বিচারে কবুল হবে না, সে হল ঐ যিন্দিক, যে গোপনে গোপনে কুফরি পোষণ করে। পক্ষান্তরে যারা প্রকাশ্যে কুফর করে বেড়ায়, তারা মুরতাদ। তারা তাওবা করলে তাওবা কবুল হবে। ফলে তাদের উপর মুরতাদের শাস্তি বর্তাবে না। যেমন হরবি কাফেররা তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে তাদের তাওবা কবুল হয়।

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

والحق أن الذي يقتل ولا تقبل توبته هو المنافق، فالزنديق إن كان حكمه كذلك فيجب أن يكون مبطنا كفره ... ويظهر تدينه بالإسلام ... وإلا فلو فرضناه مظهرا لذلك حتى تاب يجب أن لا يقتل وتقبل توبته كسائر الكفار المظهرين لكفرهم إذا أظهروا التوبة. اهـ

"বাস্তব কথা হচ্ছে, যাকে (অবশ্যই) হত্যা করে দেয়া হবে এবং তার তাওবা কবুল করা হবে না, সে হচ্ছে মুনাফিক। যিন্দিকের বিধান যদি এমনই হয়, তাহলে তার বেলায় আবশ্যক যে, সে তার কুফর গোপন করে ... এবং বাহ্যত নিজেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দাবি করে। ... অন্যথায় যদি ধরে নিই যে, সে তার কুফর প্রকাশ করে বেড়ায়, তাহলে তাওবা করলে তাকে হত্যা না করা এবং তার তাওবা কবুল করা

আবশ্যক। যেমন, অন্য সকল কাফের, যারা নিজেদের কুফর প্রকাশ করে বেড়ায়- যখন তারা তাওবা করে (তখন তাদের তাওবা গ্রহণ করা হয়)।" **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৯)**

সারকথা দাঁড়াল:

- যারা হরবি কাফের, তারা যখন তাওবা করে মুসলমান হয়ে যাবে, তাদের তাওবা আখেরাতে যেমন কবুল হবে, দুনিয়াতেও হবে। ফলে তাদের হত্যা করা হবে না।

- যারা সুস্পষ্ট মুরতাদ, তারা যদি তাওবা করে, তাহলে তাদের তাওবাও আখেরাতের সাথে সাথে দুনিয়াতেও কবুল হবে। ফলে তাদের হত্যা করা হবে না।

- যাদের বাতিন তাদের জাহিরের বিপরীত- অর্থাৎ যিন্দিক- যারা বাস্তবে কাফের কিন্তু নিজেদের বাঁচানোর জন্য বা দুনিয়াবি সুবিধা লাভের জন্য বা ছদ্মবেশে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, দুনিয়ার বিচারে তাদের তাওবা কবুল হবে না। ফলে অবশ্যই তাদের হত্যা করা হবে। তবে ইখলাসের সাথে হলে আখেরাতে মাফ পেয়ে যাবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৯১৩

জিহাদ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর যা এক ভাই জানতে চেয়েছেন

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১৬-২০১৮

এক ভাই নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চেয়েছেন:

১. ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া কাকে বলে?

২. বাংলাদেশে জিহাদ ফরয কি'না?

৩. ফরয হলে কেন ফরয?

৪. বাংলাদেশে জিহাদ ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া?

৫. জিহাদ করতে হলে তানজীমে যোগ দিতে হবে কি'না?

৬. এদেশে জিহাদ কিভাবে করবো?

৭. ফরযে কিফায়া জিহাদে যেতে হলে মা-বাবার অনুমতি লাগে এর দলীল কি?

বিস্তারিত জওয়াব লিখতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। সংক্ষেপে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ। অধিকন্তু এসব বিষয় মুজাহিদদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ। তাই বিস্তারিত জওয়াবের প্রয়োজন পড়ে না।

প্রশ্ন-১: ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া কাকে বলে?

উত্তর: এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা আপনি আব্দুল্লাহ আযযমা রহ. লিখিত **[আদদিফা আন আরাদিল মুসলিমীন]** কিতাবে পাবেন। **[মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা]** নামে এর বাংলা তরজমা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে- যেসব ইবাদত প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফরয, যেগুলো একজনের আদায়ের দ্বারা আরেকজনের দায়িত্ব আদায় হবে না, বরং সকলকেই আদায় করতে হবে: সেগুলো ফরযে আইন। যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত।

এগুলো সকলকেই আদায় করতে হবে। একজনের নামাযের দ্বারা আরেকজনের দায়িত্ব আদায় হবে না। একজনের রোযার দ্বারা আরেকজনের রোযার দায়িত্ব আদায় হবে না। একজন যাকাত দিলে আরেকজনের যাকাতের দায়িত্ব আদায় হবে না। একজন হজ্ব করলে আরেক জনের হজ্বের দায়িত্ব আদায় হবে না। বরং প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ দায়িত্ব আদায় করতে হবে। এগুলো হল ফরযে আইন।

আর যেসব বিষয় প্রতিটি ব্যক্তি থেকে হওয়া মাকসাদ না, কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেলে অন্যদের থেকে এর দায়িত্ব সরে যায়- সেগুলো ফরযে কিফায়া। সাধারণত জনকল্যাণমূলক কাজগুলো ফরযে কিফায়া হয়ে থাকে। যেমন- মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন। এটি ফরযে কিফায়া। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি মাকসাদ না, কাফন দাফন মাকসাদ। অতএব, যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনের দায়িত্ব আদায় করে ফেলে, তাহলে বাকিদের থেকে এর দায়িত্ব সরে যাবে। সকলের এতে অংশগ্রহণ জরুরী না। হ্যাঁ, অংশ নিলে সওয়াব পাবে, না নিলে সওয়াব পাবে না।

বি.দ্র.-১

পর্যাপ্ত পরিমাণ লোকের দ্বারা ফরযে কেফায়ার কাজটি সম্পাদন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা সকলের উপরই ফরয। এ সময় এটি ফরযে আইনের মতো। তবে ব্যবধান হল- ফরযে আইন সকলকেই আদায় করতে হবে, আর ফরযে কেফায়া কিছু লোকের দ্বারা আদায় হয়ে গেলে বাকিরা মুক্তি পেয়ে যাবে। আর কেউই সম্পাদন না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

বি.দ্র.-২

সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরযে কেফায়া। এর অর্থ- তখন জিহাদ সকলের উপরই ফরয, তবে কিছু সংখ্যক মুসলমান বছরে এক বার বা দুই বার জিহাদ করতে থাকলে বাকি মুসলমানরা জিহাদে না গেলেও কোন গুনাহ হবে না। আর বছরে এক বারও জিহাদ না হলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে।

আর কাফেররা আক্রমণ করে বসলে বা কোন ভূখণ্ড দখল করে নিলে, আক্রমণ প্রতিহত করতে বা ভূমি পুনঃরুদ্ধার করতে যে পরিমাণ মুসলমানের জিহাদের প্রয়োজন, সে পরিমাণ মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। অর্থাৎ সে পরিমাণ

মুসলমানকে অবশ্যই জিহাদে বের হতে হবে। এ ফরয সর্বপ্রথম যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদের উপর বর্তাবে। তারা না পারলে বা না করলে তখন অন্য মুসলমানদের উপর বর্তাবে। এভাবে যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, বিশ্বের সকল মুসলমান জিহাদে শরীক হওয়া ব্যতীত ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব না- তাহলে সকলের উপর জিহাদে শরীক হওয়া ফরযে আইন। অর্থাৎ সকলকেই জিহাদে শরীক হতে হবে। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জান-মাল ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে শরীক হবে।

বর্তমানে যেহেতু প্রায় সকল মুসলিম ভূমি কাফের মুরতাদদের দখলে, তাই বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। প্রত্যেকের উপর তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে। জান, মাল, বুদ্ধি, পরামর্শ- যে যেটা দিয়ে পারে জিহাদে শরীক হবে। যে সবগুলোর সামর্থ্য রাখে তার উপর সবগুলো দিয়ে শরীক হওয়া ফরয। আর যে সবগুলোর সামর্থ্য রাখে না, সে যতটুকুর সামর্থ্য রাখে ততটুকু দিয়ে শরীক হবে।

বি.দ্র.-৩:

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতেও অন্যান্য ফরযগুলো ফরয হিসেবেই থেকে যায়। তাই সেগুলো আদায়েও যত্নবান হতে হবে। বিশেষত বর্তমান যামানার জিহাদ যেহেতু দীর্ঘ দিনের ব্যাপার, তাই এটা একটা ঋণের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন ব্যক্তির কাছে কারো ঋণ পাওনা থাকলে, তার যদি পরিশোধের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে তাকে অর্থ উপার্জন করে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে এ অবস্থায় তাকে নামায, রোযা, স্ত্রী-সন্তান ও পিতা-মাতার হক্বও আদায় করতে হয়। ঠিক একই অবস্থা বর্তমানে জিহাদের। জিহাদও করতে হবে, অন্যান ফরয ও হক্বও আদায় করতে হবে। তবে কখনোও যদি কাফেররা কোথাও আক্রমণ করে বসে আর খন্দক যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাহলে কথা ভিন্ন।

প্রশ্ন-২: বাংলাদেশে জিহাদ ফরয কি'না?

উত্তর: হ্যাঁ, বাংলাদেশে জিহাদ ফরয।

৩. ফরয হলে কেন ফরয?

উত্তর: মুরতাদ কাফেররা এদেশ দখল করে নিয়েছে। এদের থেকে এ দেশ উদ্ধার করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ফরয।

৪. বাংলাদেশে জিহাদ ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া?

উত্তর: ফরযে আইন। তবে এর অর্থ- সকলকেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী জিহাদে শরীক হতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য ফরযও যথাযথ আদায় করতে হবে। ফরযে কেফায়ার সূরতে যেমন কিছু মুসলমান আদায় করলে বাকিদের উপর ফরয থাকে না, এখন আর তেমন নয়। সকলের উপরই ফরয। সকলকেই শরীক হতে হবে। সাথে অন্যান্য ফরযও আদায় করতে হবে। তবে একান্ত যদি কোথাও কাফেররা আক্রমণ করে বসে, তাহলে সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী মাসআলায় কিছুটা তফাৎ হবে।

৫. জিহাদ করতে হলে তানজীমে যোগ দিতে হবে কি'না?

উত্তর: জিহাদের জন্য জামাতবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেননা, জিহাদ একটি সামষ্টিক কাজ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টায় জিহাদে সফলতা সম্ভব নয়। তাই কোন হক্ক তানজীমে যুক্ত হওয়া আবশ্যক। এ মূহুর্তে হক্ক তানজীম না পেলে বা যুক্ত হতে না পারলে, যুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালাতে থাকবে। পাশাপাশি সামর্থ্যানুযায়ী তাওহিদ ও জিহাদের দাওয়াত প্রচার করতে থাকবে।

৬. এদেশে জিহাদ কিভাবে করবো?

উত্তর: হক্ক তানজীমের উমরাগণের নির্দেশনা অনুযায়ী।

৭. ফরযে কিফায়া জিহাদে যেতে হলে মা-বাবার অনুমতি লাগে এর দলীল কি?
উত্তর: এর দলীল নিম্নোক্ত হাদিস-

বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত;

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال (أحي والداك) . قال نعم قال (ففيهما فجاهد(

"এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার

পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিল: হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তাদের মাঝেই জিহাদ কর।" (সহীহ বুখারী: ২৮৪২)

অর্থাৎ তাদের খেদমত ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কর। তাহলে তুমি জিহাদে যাওয়ারই সওয়াব পাবে।

অন্য হাদিসে এসেছে,

عن معاوية بن جاهمة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال الزمها فإن الجنة عند رجلها. (قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن)

"হযরত মুআবিয়া ইবনে জাহিমা থেকে বর্ণিত যে, হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করলো, আমি যুদ্ধে যেতে চাচ্ছি। সেজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা আছেন কি? তিনি জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তাহলে তুমি তার খেদমতেই ব্যাপৃত থাক। কেননা, বেহেশত তার পায়ের নিচে।" (মুসনাদে আহমাদ: ১৫৫৭৭)

এ দুই হাদিসে পিতা-মাতা থাকাবস্থায় তাদের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত জিহাদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

কিন্তু আরেক হাদিসে এর বিপরীত এসেছে। ইবনে হিব্বান রহ. বর্ণনা করেন যে, এক সাহাবী আল্লাহ তাআলার কসম খেয়ে আরজ করেন,

والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال فقال رسول الله ﷺ فأنت أعلم

"ঐ সত্তার কসম যিনি (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন! আমি অবশ্যই অবশ্যই পিতা-মাতাকে ছেড়ে জিহাদে চলে যাবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার ব্যাপার তুমিই ভাল বুঝ।" (সহীহ ইবনে হিব্বান: ১৭২২)

এ হাদিসে সাহাবী আল্লাহর কসম করে বলছেন যে, তিনি পিতা-মাতাকে ছেড়ে জিহাদে চলে যাবেন, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করছেন না। এ থেকে বুঝা যায়, পিতা-মাতার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীতও জিহাদে যাওয়া যাবে।

এ দুই হাদিসের সমন্বয়কল্পে উলামায়ে কেরাম বলেন, প্রথম হাদিস ফরযে কেফায়ার সূরতে প্রযোজ্য আর দ্বিতীয় হাদিস ফরযে আইনের বেলায় প্রযোজ্য।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

قال جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا منع الابوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن ويشهد له ما أخرجه بن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ... فقال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما .قال: فأنت أعلم) وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. اهـ

“জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন, মুসলিম পিতা-মাতার উভয়ে বা কোন একজন নিষেধ করলে জিহাদে যাওয়া হারাম। কেননা, তাদের ফরমাবরদারি ফরযে আইন আর জিহাদ ফরযে কেফায়া। তবে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে অনুমতির প্রয়োজন নেই। এর দলীল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে ইবনে হিব্বানের বর্ণিত হাদিস: ‘এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। ... অতঃপর সে বললো, ‘ঐ সত্তার কসম যিনি (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন! আমি অবশ্যই অবশ্যই পিতা-মাতাকে ছেড়ে জিহাদে চলে যাবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার ব্যাপার তুমিই ভাল বুঝ’।

দুই হাদিসের মাঝে সমন্বয়সাধনকল্পে এ হাদিস ফরযে আইন জিহাদের বেলায় প্রযোজ্য ধরা হবে।” (ফাতহুল বারি: ৬/১৪০-১৪১)

অতএব, ফরযে আইন জিহাদের বেলায় পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। এমনকি নিরাপত্তাগত সমস্যার সম্ভাবনা থাকলে তাদেরকে জানানো ব্যতীতই কাজ

করে যেতে হবে। তবে তাদের সাথে সদাচরণ সর্বদাই বজায় রাখতে হবে। তাদের খেদমতও করতে হবে। খোর-পোষের প্রয়োজন হলে তাও ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সাথে জিহাদের কাজও করে যেতে হবে। তবে একান্তই যদি কারো বেলায় বিশেষ কোন পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাহলে তখন উলামায়ে কেরামের কাছে সরাসরি জিজ্ঞেস করে মাসআলা জেনে নেবে। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

এ সংক্রান্ত মিম্বারুত তাওহিদের একটি ফতোয়া উল্লেখ করছি। ইনশাআল্লাহ এতে বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার হবে-

أريد أن الجهاد ولكن ليس لأمي- بعد الله - غيري رقم السؤال: 586
بسم الله والصلاة والسلام على أفضل رسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فأنا شاب مسلم أريد أن أجاهد ولكن والدي متوفى وليس لأمي غيري فهل يسقط علي فرض الجهاد أما يعتبر هذا ليس بعذر شرعي
محب الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه

السائل: أبو عاصم المصري

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

أخي السائل حفظك الله ... سبقت الأجابة على العديد من الأسئلة المشابهة لسؤالك فارجع إليها في قسم الجهاد وأحكامه إن شئت، وخلاصة الجواب أن الجهاد وإن كان فرض عين في زماننا ولا يسقط عنك لعدم وجود من يرعى والدتك سواك، إلا ان هناك تفصيلا بحسب البلد التي أنت فيها وهل حضر قتال العدو فيها، وهل تعينت حاجة المجاهدين إلى أمثالك ففي مثل هذه الأحوال يجب عليك النفير ولو لم تجد من يرعى والدتك سواك لأن مصلحة الدين مقدمة على كل المصالح، وإن كان الحال غير ذلك فإنه يسعك إن شاء الله أن ترعى والدتك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا مع استصحابك نية الجهاد وتحديثك نفسك بذلك وإعدادك له والعمل في الدعوة إلى توحيد الله في بلدك

والصبر على ذلك ومساعدة المجاهدين بما استطعت إليه سبيلا ... وفقك الله

أجابه، عضو اللجنة الشرعية: الشيخ أبو أسامة الشامي

"আমি জিহাদে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু আমি ছাড়া আমার মাকে দেখার মতো কেউ নেই

প্রশ্ন নং ৫৮৬

প্রশ্ন: আমি জিহাদে যেতে চাই। কিন্তু আমার পিতা মারা গেছেন। আমি ছাড়া আমার মায়ের আর কেউ নেই। আমার উপর কি জিহাদ ফরয? না'কি এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওজর ধরা হবে না?

উত্তর: ... বর্তমান যামানায় জিহাদ যদিও ফরযে আইন এবং আপনি ছাড়া আপনার মাকে দেখার কেউ না থাকলেও আপনি জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবেন না, তবে এখানে কিছু তাফসীল আছে। আপনি যে শহরে আছেন সে শহর হিসেবে। সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে কি'না এবং আপনার মতো লোকদের প্রতি মুজাহিদদের অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কি'না- সে হিসেবে। অবস্থা এমন হলে আপনাকে জিহাদে বের হতে হবে, যদিও আপনার মাকে দেখার কেউ না থাকে। কেননা, দ্বীনি মাসলাহাত সকল মাসলাহাতের তুলনায় অগ্রগণ্য। আর যদি অবস্থা এমন না হয়ে থাকে, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি আপনার মায়ের দেখাশুনা করতে পারবেন, যত দিন না আল্লাহ তাআলা ভিন্ন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। সাথে সাথে আপনি জিহাদের নিয়ত রাখবেন। জিহাদের আকাঙ্খায় থাকবেন। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। আপনার শহরে আপনি আল্লাহ তাআলার তাওহিদের প্রতি দাওয়াত দেয়ার কাজ চালাতে থাকবেন। ধৈর্যের সাথে এগুলো করতে থাকবেন। সামর্থ্যানুযায়ী মুজাহিদদের সহায়তা করতে থাকবেন। **وفقك الله**

উত্তর প্রদানে:

আবু উসামা আশশামী

সদস্য, শরয়ী বিভাগ, মিম্বারুত তাওহিদ।"

প্রশ্নোক্ত সূরতে জিহাদ এবং মায়ের খেদমত উভয়টাই ফরযে আইন। উভয়টাই আদায় জরুরী। এজন্য মায়ের খেদমত করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সামর্থ্যানুযায়ী

দাওয়াত ও জিহাদের কাজ করে যেতে বলা হয়েছে। তবে কখনোও যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে এবং ময়দানে বের হওয়া ছাড়া উপায় না থাকে, তখন মাকে দেখার কেউ না থাকলেও ময়দানে চলে যেতে বলা হয়েছে।

হুবহু একই পরিস্থিতি আমাদের দেশের। স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা সকলের প্রাপ্য হক আদায় করতে হবে। সাথে জিহাদের কাজও করে যেতে হবে। হ্যাঁ, কখনো বা কোন কোন ভাইয়ের ক্ষেত্রে যদি বিশেষ কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাহলে কথা ভিন্ন।

আশাকরি ভাইদের কাছে বিষয়টি কিছুটা হলেও পরিষ্কার হয়েছে। আমি বার বার এ কথাটা আলোচনায় আনছি, যাতে আমাদের মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলার কোন ফরয যেন ভুল বুঝের কারণে বা গাফলতবশত তরক না করি। জিহাদ যে আল্লাহর জন্য করবো, অন্যান্য ফরযগুলো সে আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করেছেন। এ জন্য জিহাদে যেমন গুরুত্ব দেব, অন্যান্য ফরযের ব্যাপারেও তেমনই গুরুত্ব দেব। তবে হ্যাঁ, যেহেতু জিহাদের ময়দান অবহেলিত, লোকের অভাব- সেজন্য জিহাদের ব্যাপারে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দেব। প্রয়োজনে আমাদের সব কিছু জিহাদের জন্য কুরবান করে দেব। তবে অন্য কোন ফরয যেন না ছুটে যায় সেদিকেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখবো। আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীর প্রতি, তার বেঁধে দেয়া সীমার প্রতি সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখাই একজন মুজাহিদের সিফাত। আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের সিফাত উল্লেখ করে বলেন,

{التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ } (112)

“তারা তাওবাকারী, ইবাদতগুজার, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশ প্রদানকারী, অসৎকাজ হতে বারণকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিতসীমা হিফাযতকারী।” (তাওবা: ১১২)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝের সাথে জিহাদ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العلمين.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৭৫৪

আল্লাহর আইনের বিপরীত বিচার করা : ইসলাম কী বলে?

saif abdullah

Moderator

০৪-২১-২০১৯

এ বিষয়টি নিয়ে অনেকের মাঝে বেশ ইখতিলাফ ও বিতর্ক দেখা যায়। কিছু মানুষ আছে, যারা এটাকে কোনোভাবেই কুফর মানতে চায় না। অনেকে তো সকল ক্ষেত্রেই কুফর বলে প্রচার করে। এদিকে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর দেওয়া আইন অনুসারে বিচার না করলে সে কাফির, ফাসিক ও জালিম। এগুলোরই বা রহস্য কী? একই অপরাধীর ক্ষেত্রে তিনরকম বিধান কেন? এখানে মূল আলোচনার বিষয় হলো, মানবরচিত আইনে বিচার করা কুফরে আকবার বা বড় কুফর কিনা, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে এভাবে উত্তর হবে যে, যদি রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সে আল্লাহর আইনকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও পার্থিব স্বার্থে কখনো ভিন্ন আইনে বিচার করে অথবা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিচারকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে তাহলে সে কাফির নয়; বরং জালিম। এ ধরনের কুফরকে বলা হবে 'কুফর দুনা কুফর।' অর্থাৎ এর কারণে সে মারাত্মক গুনাহগার হলেও দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে না। আর যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নিয়মিত সে অনুসারেই বিচার-আচার করা হয় কিংবা সে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনকেই সঠিক ও শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করে অথবা মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে এ আইন অনুসারে ফয়সালা করাকে বাধ্যতামূলক বিশ্বাস করে তাহলে তার কুফর ও ইরতিদাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট। এখানে তার কুফরির ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ করার অবকাশ নেই। এটাকে 'কুফর দুনা কুফর' বলে যারা বিষয়টিকে হালকা করে প্রচার করে, তারা নিশ্চিত দ্বীনের অপব্যাখ্যা করে তাগুতদের খুশি করতে চায়। আমরা এদের থেকে মুক্ত এবং তারাও আমাদের থেকে মুক্ত।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করবেনা তারা কাফির, ফাসিক ও জালিম। তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে এ তিন শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

১. কাফির : এর উদাহরণ হলো, যখন কোনো ব্যভিচারীর বিচার করার সময় সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কিন্তু বিচারক তাকে শরিয়াসম্মত শাস্তি না দিয়ে মানবরচিত অন্য কোনো শাস্তি দেয় অথবা জেল-জরিমানা করে। সে এ কথা বলে যে, আমরা এ ধরনের অপরাধের জন্য এমন শাস্তিই দিয়ে থাকি। অর্থাৎ এ অপরাধের জন্য এটাই আমাদের শাস্তির নির্ধারিত ও চূড়ান্ত বিধান। তাহলে এতে সে আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে ফেলায় পরিপূর্ণরূপে কাফির সাব্যস্ত হবে।

২. জালিম : এর উদাহরণও একই। তবে পার্থক্য হলো, এই বিচারক আল্লাহর বিধান মানে, আইনেও তা লেখা আছে এবং ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারও করে না। কিন্তু সে কিছু লোককে শরিয়া নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করে না। কারণ, তার সাথে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের ভালো সম্পর্ক আছে। অথবা তাদের সামাজিক মর্যাদা উঁচু। অথবা তারা তাকে ঘুষ দিয়েছে। তাহলে এমন বিচারক জালিম হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩. ফাসিক : তার উদাহরণ হলো, সে শরিয়া অনুযায়ী বিচার করে ঠিক, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নিজের সুবিধার জন্য অথবা ভয়ের কারণে সে এমন কিছু অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে, যাতে এ শাস্তি বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকা যায়। যেমন ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষী আছে। তখন বিচারক অপরাধীকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বলল, এই সাক্ষী ভালোভাবে ঘটনা দেখেনি। অথবা অমুক সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ নয়। এভাবে সে সাক্ষীদেরকে বিভিন্ন মিথ্যা ও ভুয়া অজুহাত দেখিয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধাপ্রদান করল। তাহলে এমন বিচারক ফাসিক বলে বিবেচিত হবে।

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম রহ. বলেন :

وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفر. إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين

بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة.

'আল্লাহর আইনকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য আইনে বিচার-ফয়সালা করে নিজেকে গুনাহগার ভাবলে তার ব্যাপারে যে বলা হয়েছে 'কুফর দুনা কুফর'। আর এটা কেবল ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার থেকে তা এক-দুবার প্রকাশ পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আইনকানুন তৈরি করবে এবং তা মেনে চলবে তখন তা অবশ্যই কুফর বলে বিবেচিত হবে; যদিও সে একথা বলে যে, (এর কারণে) আমি গুনাহগার হয়েছি এবং শরিয়তের ফয়সালাই অধিক নিষ্ঠাপূর্ণ। অতঃপর সে (শরিয়তের) চূড়ান্ত, প্রমাণিত ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত আইনকে বাদ দিয়ে সেটাকে (মানবরচিত আইনকে) মূল বানিয়ে নিয়েছে। অতএব, তা এমন কুফর বলে গণ্য হবে, যা তাকে দ্বীন থেকে বহিষ্কার করে দেয়।' (ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম : ১২/২৮০, ফতোয়া নং ৪০৬০, প্রকাশনী : মাতবাআতুল হুকুমাহ, মক্কা)

এ বিষয়ে অনেক উলামায়ে কিরাম এমনই বক্তব্য পেশ করেছেন। তাদের সকলের তাফসির বা মন্তব্য থেকে একথাই স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা আল্লাহর সাথে এক জঘন্য ও স্পষ্ট ঔদ্ধত্য। অথচ বর্তমানে প্রায় সকল মুসলিম ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, জেনে বা না জেনে মানবরচিত আইনে পরিচালিত কোর্টের সামনে বিচারের জন্য ভিড় জমায়।

উম্মাহর ফকিহগণ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান দ্বারা বিচারকারীদেরকেই শুধু কাফিরই বলেননি; বরং তাদের পক্ষ অবলম্বনকারী আলিমদেরকেও কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

وَمَتَى تَرَكَ الْعَالِمُ مَا عَلِمَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَاتَّبَعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَ مُرْتَدًّا كَافِرًا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

'আর যখন কোনো আলিম কোরআন-সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী বিচারকের অনুসরণ করে,

তখন সে একজন ধর্মত্যাগী এবং কাফির হিসাবে বিবেচিত হেএ, যে দুনিয়া ও আখিরাত-উভয় জাহানে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।' (মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ৩৫/৩৭৩, প্রকাশনী : মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বিচার-ফয়সালা এবং বিধান। বিচার-ফয়সালা হলো বিধানেরই একটি অংশ বিশেষ। আর বিধান হলো আল্লাহর তাআলার পূর্ণ আইনব্যবস্থা। সুতরাং শুধু বিচার-ফয়সালা থেকে বিধান বাদ দেওয়া আর সম্পূর্ণ বিধানকেই পরিত্যাগ করা দুটো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কাজেই যদি কোনো শাসক আল্লাহর শরিয়া অনুযায়ী বিচার না করে তখন বিধানের অন্য ধারার প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন চলে আসে যে, সে কি কাফের নাকি মুসলিম? সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে শরিয়াকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তা বাস্তবায়ন না করা তার বড় কুফরিকেই আবশ্যক করে। আর যদি আল্লাহর বিধান বলবৎ থাকা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে শরিয়া বাদ দিয়ে সে বিচার করে তাহলে সেটা হবে এক ধরনের কুফর অর্থাৎ ছোট কুফুর। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি সংবিধান হিসাবে শরিয়া বলবৎ থাকে তাহলে শরিয়া আইন বাস্তবায়ন না হলে এটা হবে ছোট কুফর। আর যদি সংবিধানকে শরিয়ত ছাড়া অন্য কোনো আইন বা তন্ত্র দ্বারা পরিবর্তন করা হয় তাহলে সেটা হবে বড় কুফর।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. তাঁর যুগেও যখন এমন বাস্তবতা অবলোকন করেছিলেন তখন ঠিকই তিনি এ বিষয়ে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে তাদের বড় কুফরির কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে মাসআলা গোপন রাখার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন :

وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جِنْكِزْخَانَ الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ الياسق، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قد اقتبسها من شَرَائِعَ شَتَّى: مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وغيرها، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نظره وهواه، فصارت في بينه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فَلَا يَحْكُمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ.

‘যেরকমভাবে (মুসলিম নামধারী) মোঙ্গলীয় শাসকরা চেঙ্গিস খানের প্রণীত সংবিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করত, যা তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের ‘ইয়াসিক’ নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ‘ইয়াসিক’ এমন একটি আইনগ্রন্থ, যা বিভিন্ন ধর্ম তথা ইহুদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে তার নিজস্ব খেয়ালখুশি ও চিন্তাধারারও অনেক আইন সন্নিবেশিত ছিল। এভাবেই এটা তাদের মাঝে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে স্বীকৃতি পায়। তারা (নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করলেও) আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর উপর এটাকে প্রাধান্য দিত। অতএব, যে কেউ এমনটা করবে সে কাফির হয়ে যাবে। তার বিরূদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করতে হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং কমবেশি কোনো বিষয়েই তিনি ছাড়া কেউ ফয়সালা করতে পারবে না।’ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৩/১১৯, প্রকাশনী : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন দিয়ে বিচার করার এ বিধান বর্তমান মুসলিম সমাজের অনেকেই জানেন না, কিছু মানুষ জানলেও মুখ খোলে না। অথচ বিষয়টি জানা সবারই প্রয়োজন। কেউ যদি মুখ না খোলে, তাহলে মানুষ কীভাবে জানবে দ্বীনের বিধান? সবাই যদি সম্মিলিতভাবে এসব বিধানের ব্যাপারে নীরব থাকে, তাহলে কিয়ামতের দিন আমাদের কেউই মুক্তি পাবে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‘নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কোরআনের বিধান গোপন করে এবং এর বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের উদরে আগুনই ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ তাআলা না তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।’ (সুরা আল-বাকারা : ১৭৪)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩০৮৬

দারুল হরবে জুমআ

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-১৯-২০১৮

এক ভাই জানতে চেয়েছেন, হানাফি মাযহাব মতে জুমআর নামায সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম বা তার নায়েব থাকা শর্ত। আমাদের উপমহাদেশ তো দারুল হরব। ইমাম নেই, নায়েবও নেই। তাহলে আমরা জুমআ আদায় করছি কোন দলীলের ভিতিতে?

উত্তর:

জুমআর জন্য ইমাম বা তার নায়েব থাকা শর্ত- কথাটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এখানে ব্যাখ্যা আছে। মূল কথা হলো, জুমআ আল্লাহ তাআলা সকলের উপর ফরয করেছেন। ইমাম থাকার কোন শর্ত কোথাও নেই। তবে ইমাম থাকলে ইমামের হক হিসেবে তাকে অগ্রগামী রাখতে হবে। ইমাম না থাকলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে। ফিকহের ইবারত থেকে বিষয়টা ইনশাআল্লাহ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯হি.) আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য বর্ণনা করেন,

لا تكون جمعة إلا بإمام. اهـ

"ইমাম ছাড়া জুমআ হবে না।"- কিতাবুল আছল: ১/৩৬০

মুহাম্মাদ রহ. আরোও বলেন,

قلت: أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين من غير أن يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان خليفة الأمير أو صاحب شرطة أو القاضي؟ قال تجزيهم صلاتهم. اهـ

“আমি আবু হানিফা রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি অভিমত, যদি কোন ব্যক্তি আমীরের আদেশ ছাড়াই লোকদের নিয়ে জুমআর দিন দুই রাকাআত পড়ে নেয়? তিনি জওয়াব দিলেন, ‘তাদের নামায হবে না। তাদেরকে নতুন করে জোহর পড়তে হবে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি আমীর তাকে নির্দেশ দিয়ে থাকে, কিংবা ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ যে লোকদের নিয়ে জুমআ পড়েছে) সে আমীরের নায়েব, আইনশৃংখলারক্ষীবাহিনীর প্রধান কিংবা কাযি হয়- তাহলে আপনার কি অভিমত? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে তাদের নামায হয়ে যাবে।”- কিতাবুল আছল: ১/৩৬০

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বক্তব্য সুস্পষ্ট যে, জুমআ সহী হওয়ার জন্য হয়তো স্বয়ং ইমাম লাগবে, নতুবা তার আদেশকৃত কিংবা নিয়োগকৃত ব্যক্তি লাগবে।

আরোও দেখুন:

- মুখতাসারুত তহাবী [ইমাম তহাবী রহ. (৩২১হি.): পৃ ৩৪

- মুখতাসারুল কুদূরী [ইমাম কুদূরী রহ. (৪২৮হি.): পৃ. ৫১

- মাবসূতে সারাখসী [শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (৪৯০হি.)]: ২/৪১

এ বিধান হলো, যখন ইমাম থাকবেন। পক্ষান্তরে যদি কোন কারণে ইমাম না থাকেন– যেমন মুসলমানদের পারস্পরিক ফিতনা ও মারামারি কাটাকাটির কারণে কিংবা দেশ কাফেরদের করতলগত হয়ে যাওয়ার কারণে- তাহলে জুমআর দায়িত্ব মুসলমানদের নিজেদের উপর বর্তাবে। তাদের জন্য আবশ্যক, জুমআর জন্য ইমাম নিয়োগ দিয়ে জুমআ আদায় করা। পাশাপাশি ইমাম নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালানো।

তদ্রূপ ইমাম থাকাবস্থায় যদি ইমাম জুমআ আদায় করতে নিষেধ করেন, তাহলে তার কথা মানা যাবে না। জুমআর সময় হয়ে গেলে মুসলমানরা নিজেরা একজনকে ইমাম নির্ধারণ করে জুমআ আদায় করে নেবে।

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيبا للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلا

وبهذا ظهر جهل من يقول لا تصح الجمعة في أيام الفتنة مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار. اهـ

"যদি শাসনকর্তা মৃত্যুবরণ করেন অথবা ফিতনার কারণে উপস্থিত না হতে পারেন এবং এমন কাউকে না পাওয়া যায়, যার জুমআ কায়েমের অধিকার রয়েছে, তাহলে জরূরতের কারণে সাধারণ মানুষ নিজেদের জন্য একজন খতীব নির্ধারণ করে নেবে। ... এ থেকে ঐ ব্যক্তির অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়ে গেছে, যে বলে, ফেতনার যামানায় জুমআ সহীহ হবে না, অথচ ঐ সমস্ত দেশেও জুমআ সহীহ, যেগুলো কাফেররা দখল করে নিয়েছে।"- রদ্দুল মুহতার: ২/১৩৮

সামনে গিয়ে বলেন,

فلو الولاة كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما. اهـ

"যদি প্রশাসকরা কাফের হয় তাহলেও মুসলমানদের জন্য জুমআ কায়েম করা জায়েয আছে। এক্ষেত্রে মুসলমানদের সন্তুষ্টিক্রমে নিয়োগপ্রাপ্ত কাযী শরঈ কাযী গণ্য হবেন। তবে মুসলমানদের উপর ফরয, একজন মুসলমান প্রশাসক তালাশ করা।" - রদ্দুল মুহতার: ২/১৪৪

আরো বলেন,

لو منع السلطان أهل مصر أن يجمعوا إضرارا وتعنتا فلهم أن يجمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة. اهـ

"সুলতান যদি কেবল একগুঁয়েমি করে কোন এলাকার লোকজনকে জুমআ আদায়ে বাধা দেন, আর এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য তাদের ক্ষতিসাধন ব্যতীত কিছু নয়, তাহলে তারা নিজেরা সম্মতিক্রমে একজনকে জুমআর জন্য নির্ধারণ করে নিয়ে তার পেছনে জুমআ পড়তে পারবে।"- রদ্দুল মুহতার: ২/১৪৩

সারকথা দাঁড়াল,

- হানাফি মাযহাব মতে ইমাম থাকলে ইমাম বা নায়েব জুমআ পড়াবেন। কোন কারণে ইমাম না থাকলেও জুমআ বাদ যাবে না। মুসলমানরা নিজেরা একজনকে

ইমাম বানিয়ে জুমআ আদায় করবে। যেসব রাষ্ট্র কাফেরদের দখলে সেগুলোতেও জুমআর ইমাম নিয়োগ দিয়ে জুমআ আদায় করতে হবে।

- ইমাম থাকাবস্থায় যদি কোন শরয়ী উজর ব্যতীত তিনি জুমআ আদায় করতে নিষেধ করেন, তাহলে তার আনুগত্য করা যাবে না। সাধারণ জনগণ নিজেরা জুমআর ইমাম নিয়োগ দিয়ে জুমআ আদায় করে নেবে।

বি.দ্র.

জিহাদও জুমআর মতো। যদি ইমাম থাকেন, তাহলে তিনি জিহাদের ডাক দেবেন। ইমাম যদি জিহাদের ডাক না দেন বা জিহাদে যেতে বাধা দেন, তাহলে জনসাধারণ নিজেরা জিহাদের আমীর ঠিক করে জিহাদ করবে। আর যখন ইমাম না থাকবে, তখনও জিহাদ মাফ নেই। জিহাদের আমীর ঠিক করে শক্তি অর্জন করত জিহাদ করতে হবে। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম। *

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৫৩৮

*****